ইতিহাসের কাঠগড়ায়

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

মাওলানা মুহম্মদ তকী উসমানী
সাবেক বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট (শরী'আ)
পাকিস্তান।

রূপান্তর
মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ্
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
ঢাকা-১৩১০

প্রকাশনায়

দারুল কলম
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্, আশরাফাবাদ
ঢাকা-১৩১০

সূচীপত্র

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ব্যক্তি-চরিত্র-অবদান

উৎসর্গ

মহান আকাবির ও পূর্বসূরীগণের নিভে যাওয়া শেষ 'স্মৃতি-প্রদীপ', আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) এর মাগফেরাত কামনায়।

মনে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিলো; প্রেস থেকে বের হওয়া প্রথম কপিটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে দু'আ নেবো। বারবার তিনি তাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ছাপা শেষ হতে আর কত দেরী? এমনকি হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তেও। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারি নি, এ তাড়া দেয়ার পিছনে রহস্য কী?

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণ করবো, ততদিন তাঁর রূহানি 'ফায়য' অবশ্যই লাভ করবো ইনশাআল্লাহ্। বিরহকাতর হৃদয়ের জন্য এ বড় সান্ত্বনা। আল্লাহ্ তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত এবং সর্বোত্তম কল্যাণে অভিষিক্ত করুন। জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মুকাম নসিব করুন। নূরে রহমতে তাঁর কবর পূর্ণ করুন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

ইতিহাসের কাঠগড়ায়
হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

অনুবাদকের কথা

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নবী-জীবনে আসমানী অহীর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মানবসভ্যতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শরূপে যে মুবারক জামা'আত তৈরী করেছিলেন, তাঁরা হলেন 'ছাহাবা'। তাঁদের নামের সঙ্গে আমরা বলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু—অর্থাৎ তাঁদের প্রতি হোক আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্য-সান্নিধ্যের বরকতে এই মুবারক জামা'আতের প্রত্যেক সদস্য ছিলেন নফস ও প্রবৃত্তির সব রকম মলিনতা থেকে চিরপবিত্র। মানুষের মুক্তি ও মানবতার কল্যাণে জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় তাঁরা ছিলেন উৎসর্গিত। ইকামতে দ্বীন তথা পথহারা মানব কাফেলাকে আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে আনাই ছিলো তাঁদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এ জন্য যে সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানী তাঁরা দিয়েছেন এবং যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন তাঁরা সয়েছেন পৃথিবীর কোন ধর্মের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

সবদিকে যখন ছিলো শিরক ও কুফরীর ভয়ংকর অন্ধকার; ছিলো অধর্ম ও পাশবিকতার জয় জয়কার; মানবতার সেই চরম দুর্দিনে ঈমান ও তাওহীদের এ ক্ষুদ্র কাফেলাই রুখে দাঁড়িয়েছিলো পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে। বাতিলের বুতখানায় তাঁদের নিঃশংক কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লার মহাবিপ্লবী ঘোষণা। বদর-অহুদ ও য়ারমুক-কাদেসিয়ায় তাঁদেরই বুকের তাজা খুনে লেখা হয়েছিলো ইসলামের বিজয় ইতিহাস এবং মানব সভ্যতার চিরমুক্তির মহাপয়গাম।

রাসূলের পূণ্য হাতে গড়া এই ছাহাবা-দল তাঁর ওয়াফাতের পর ঈমান ও সত্যের চিরঅনির্বাণ মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর দিকে দিকে। তাই আজ ইস্তাম্বুল থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত পাওয়া যায় তাঁদের কবরের সন্ধান। ছাহাবা কেরামের এই মহান ত্যাগ ও কোরবানীরই বদৌলতে সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের ব্যবধানেও আমরা আজ দ্বীন পেয়েছি; পেয়েছি ঈমান ও তাওহীদের আলো।

তাই কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মাহ্‌র প্রতি তাঁদের ইহ্‌সান অপরিসীম; অপ্রতিশোধ্য তাঁদের ঋণ। হিদায়াত ও সরল পথের সন্ধান পেতে হলে তাঁদেরকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে জীবন-পথের বাঁকে বাঁকে। কেননা ছাহাবা কেরাম হলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ ও মহোত্তম চরিত্রের বাস্তব নমুনা। এই মুবারক জামা'আতকে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি ঘোষণা করে আল-কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الآ انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون -

'যখন তাদের বলা হয়; লোকেরা (ছাহাবাগণ) যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরা অনুরূপ ঈমান আনো; তখন তারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের মতই ঈমান আনবো? মনে রেখো; তারাই কিন্তু নির্বোধ, তবে সে কথা তারা জানে না।'

এই মুবারক জামা'আতের ফজিলত, মর্যাদা ও অবস্থান নির্দেশ করে বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন—

من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحى لاتؤمن عليه الفتنة، اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا افضل هذه الامة، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فى هديهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم -

'কেউ যদি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায় তাহলে বিগতদের তরীকাই তার অনুসরণ করা উচিত। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনার সম্ভাবনামুক্ত নয়। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা। হৃদয়ের পবিত্রতায়, 'ইলমের গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তাঁরা ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জামা'আত। আল্লাহ্ তাঁদেরকে আপন নবীর সঙ্গলাভ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও এবং তাঁদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করো। কেননা তাঁরা ছিলেন সরল পথের পথিক।'

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের মুবারক জামা'আত সম্পর্কে এ-ই হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত আকীদা ও মৌল বিশ্বাস। এটা অবশ্য ঠিক যে, ছাহাবাগণও মাটির মানুষ ছিলেন, নুরের ফিরিশতা ছিলেন না। তদ্রূপ নবী রাসূলগণের মত মাসূম ও নিষ্পাপও ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের কারো করো জীবনে মানবীয় দুর্বলতার একদু'টি বিচ্ছিন্ন প্রকাশ ঘটা অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়। তাই বলে সেগুলোকে মূলধন করে ছাহাবা কেরামের সমালোচনা তথা ছিদ্রান্বেষণ ও চরিত্রহননের কোন অধকার নেই পরবর্তীদের। কেননা হৃদয় ও আত্মার স্বভাব পবিত্রতার কারণে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা নাযিল করেছেন তাঁর পাক কালামে

رضى الله عنهم ورضوا عنه

'আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।'

সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সনদ দিয়েছেন এভাবে—

اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم

'আমার ছাহাবাগণ তারকাতুল্য। সুতরাং তোমরা তাদের যে কারো অনুসরণ করবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।'

আল্লাহ্‌র রাসূলের অজানা ছিলো না যে, তাঁর পরে তাঁর উম্মতের একদল ভ্রষ্ট লোক ছাহাবা কেরামের সমালোচনায় মেতে ওঠবে এবং পরিণামে নিজেদের ও অনুগামীদের ঈমান ও আখেরাত বরবাদ করে বসবে। তাই উম্মাহকে এ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে তিনি ইরশাদ করেছেন—

الله الله فى اصحابى لاتتخذوهم غرضا من بعدى

'আমার ছাহাবাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করো! আল্লাহ্‌কে ভয় করো! আমার মৃত্যুর পর তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না।'

পরবর্তীকালে উম্মাহ্‌র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও ছাহাবা-সমালোচনার সর্বনাশা সয়লাব রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর জীবনে এক ব্যক্তিকেই শুধু দোররা মেরেছিলেন। ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র সমালোচনা ছিলো তার অপরাধ।

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের প্রতি উম্মাহ্র আস্থা ও শ্রদ্ধায় যেদিন সামান্য ফাটল ধরবে, সেদিন রাসূল ও তাঁর উম্মাহ্র মাঝে বিদ্যমান যোগসূত্রই ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দ্বীন ও ঈমানের গোটা বুনিয়াদই ধ্বসে পড়বে। কেননা, ছাহাবা কেরাম হলেন কোরআন ও সুন্নাহ্র (শব্দ ও মর্মের) প্রথম বাহক এবং অহী অবতরণের প্রত্যক্ষদর্শী। সর্বোপরি তাঁরা হলেন আসমানী শিক্ষা ও নববী দীক্ষার বাস্তব নমুনা।

ইসলামের ধূর্ত শত্রুরা গোড়া থেকেই এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলো। তাই হযরত উসমান (রাঃ)-র খিলাফতকালেই ইহুদী বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ্ বিন সাবার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাবাঈ চক্র। এই অশুভ চক্র মহান খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-সহ বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত প্রশাসক ছাহাবাগণের বিরুদ্ধে ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র অপপ্রচারের এমন সর্বনাশা ঝড় বইয়ে দেয় যা মজলুম খলীফা হযরত উসমানের প্রাণ হরণ করেও ক্ষান্ত হয় নি। পরবর্তীতে সাবাঈ চক্র হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কেই তাদের ঘৃণ্য অপপ্রচারের টার্গেট বানিয়ে নেয়। কেননা এ মহান ছাহাবীর দু' একটি ইজতিহাদী ভুল তাদের অনুকূলে বেশ উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলো।

পরবর্তীকালে ক্রুশেড যুদ্ধে বিপর্যস্ত খৃস্টান জগতও ইসলামী উম্মাহ্র বিরুদ্ধে ওরেন্টিয়ালিস্টদের নেতৃত্বে অভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছিলো। প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাবাঈ ও শিয়া বর্ণনাগুলোই ছিলো তাদের মূলধন। বলাবাহুল্য যে, ওরেন্টিয়ালিস্টদের এ সুপরিকল্পিত হামলা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ছিলো আরো ভয়াবহ। কেননা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও তাহযীব তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় গবেষণা ও জ্ঞান-অবদানের মাধ্যমে প্রাচ্যবিশারদরা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অভিভূত হৃদয়ের শ্রদ্ধাসনে নিজেদের দখল মজবুত করে নিয়েছিলো আগে থেকেই। ফলে এদের কাছে প্রাচ্যবিশারদরাই ছিলো ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অথারিটির মর্যাদাভোগী।

এই 'নব্য সাবাঈ' অপপ্রচারের ফলে ছাহাবা কেরামের ভাবমর্যাদা এমনই বিধ্বস্ত হলো যে, কোন কোন আরব বুদ্ধিজীবী এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যও করতে লাগলেন—

هم رجال ونحن رجال

(বুদ্ধি ও মেধায়) তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

উপমহাদেশীয় 'পণ্ডিত' আবুল আলা মওদূদী সে কথাটাকেই 'একাডেমিক' ভাষা দিলেন এভাবে—

صحابہ کرام معیارِ حق نہیں ہیں

ছাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি নন।

সুতরাং কোরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ছাহাবাদের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন, বরং উদার ও মুক্ত বুদ্ধির আলোকে কোরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ অধ্যয়নই হলো দ্বীনের নির্ভেজাল জ্ঞান সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায়। বলাবাহুল্য যে, এই সর্বনাশা চিন্তা কেরাআন-সুন্নাহ্র মনগড়া ব্যাখ্যা ও বিকৃত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন বাঁধভাঙ্গা সয়লাব নিয়ে আসবে যে, ইসলামকে তখন তার নববী আকৃতি ও প্রকৃতিতে বহাল রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি উপরোক্ত নোসখা মেনে নিলে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী রোধ করারও কোন উপায় থাকবে না।

তাই যুগে যুগে ইসলামী উম্মাহ্র সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলিম ও চিন্তানায়কগণ এ সকল ফিতনার মোকাবেলায় প্রতিরোধের ইস্পাত-প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন এবং উম্মাহ্কে ছাহাবা-বিরোধী অপপ্রচারের গোপন উদ্দেশ্য ও ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছেন। ওলামায়ে কেরামের এ নীরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধের বদৌলতে সব যুগেই উম্মাহ্র গরিষ্ঠ অংশ এ সর্বনাশা ফিতনার ছোবল থেকে নিরাপদ ছিলো। তবে গোমরাহী যাদের কপালের লিখন তাদের কথা ভিন্ন।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র বড় দুর্ভাগ্য এই যে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে উপমহাদেশের বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল আলা মওদূদী সাহেব ছাহাবা-বিরোধী অপপ্রচারের সেই পুরনো ফিতনা নুতন করে উসকে দিয়েছিলেন। ফলে হাজারো সমস্যার ভারে জর্জরিত মুসলিম উম্মাহ্ চিন্তা ও মানস জগতে আজ এক ভয়াবহ দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছে। মাওলানা সাহেব তাঁর 'খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত' গ্রন্থে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে আরোপিত জঘন্যতম অপবাদগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণ করার এমন ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছেন যে, উপমহাদেশের সচেতন আলেম সমাজের পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হলো না। ধারাবাহিক ঐতিহ্য হিসাবেই তাঁদের কলম গর্জে উঠলো সমকালীন সাবাঈ ফিতনার বিরুদ্ধে। মজলুম ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী আরোপিত প্রতিটি অভিযোগের তাঁরা দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন।

তেমনি একটি জবাব হলো পাকিস্তান শরীয়া কোর্টের বিচারপতি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলিমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী বিরচিত حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق (হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং ঐতিহাসিক সত্য) গ্রন্থটি।

উপমহাদেশীয় বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগানো এ বইটি আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে আমার হাতে আসলেও তখন তা বাংলায় অনুবাদ করার বিশেষ তাগাদা অনুভব করি নি। কেননা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অঙ্গনে এ ধরনের নাযুক আলোচনা পরিহার করে চলাই আমাদের আন্তরিক কামনা ছিলো। আমরা চেয়েছিলাম, পশ্চিমের ফিতনা পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ থাকুক। কিন্তু সম্প্রতি (বাংলাদেশ জামা'আতে ইসলামীর প্রকাশনা সংস্থা) আধুনিক প্রকাশনী মাওলানা মওদূদী-রচিত বইটি 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' নামে প্রকাশ করায় আমাদেরও একান্ত অনন্যোপায় হয়ে মাওলানা তাকী উসমানী রচিত জবাবী বইখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে হলো।

মজার ব্যাপার এই যে, অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি জনৈক জামাত নেতাকে দেখালে তিনি উপদেশ বিতরণের নকশায় বললেন, আপনার অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য এবং ... কিন্তু এভাবে নিজেদের মধ্যে 'লাঠালাঠি' করে এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা ছাড়া আর কি মহৎকার্য হবে বলুন? জবাবে বিনীতভাবে আরয করলাম, জনাব! দোষ কিন্তু নন্দঘোষের নয়। কেননা মওদূদী সাহেব পশ্চিমে যে ল্যাঠা লাগিয়েছেন সে ল্যাঠা আপনারা পুবে আমদানী করেছেন বলেই না আমাদেরকেও দাওয়াই হিসাবে কিঞ্চিত লাঠির ব্যবস্থা করতে হলো। আর তাতেই না লাঠালাঠির সূত্রপাত হলো।

যাই হোক; এখনো আমরা কোনরূপ উত্তপ্ত বিতর্ক কিংবা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি পসন্দ করি না। খিলাফত ও রাজতন্ত্র বইটির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য বাংলাদেশের পাঠকবর্গের হাতে এসে গেছে। আমরাও 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া' (রাঃ)-র মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের বক্তব্য তুলে ধরলাম। এবার সত্য নির্ধারণের দায়িত্ব পাঠকবর্গের উপর। মাওলানা মওদূদী আজ বেঁচে নেই। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে আমরা শুধু এই কামনা করতে পারি যে, আল্লাহ্ তাঁর নেক আমলগুলোর উত্তম বিনিময় দান করুন এবং পদস্খলনগুলো ক্ষমা করুন।

অনুবাদ সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করি। মূল বইয়ের তথ্য ও উপস্থাপনা অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভঙ্গি ও শৈলী অনুসরণ

করা হয়েছে। ফলে এদিক থেকে মূলের সাথে অনুবাদের কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আরো সোজা কথায় বলতে গেলে মূলের ভাষাশৈলী ছিলো জ্ঞানগম্ভীর ও শান্ত-সুশীল। পক্ষান্তরে অনুবাদের ভাষাশৈলী হয়েছে কিছুটা তর্কমুখী ও অম্লমধুর। মূল ও অনুবাদের নামগত পার্থক্য থেকেও বিষয়টি বোঝা যাবে। এ ছাড়া বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টি বাংলাদেশী পাঠকের জন্য খুব বেশী প্রয়োজনীয় মনে না হওয়ায় বাদ দেয়া হয়েছে।

সুহৃদ বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল বরিশালী পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে দিয়ে বেশ কিছু খুঁত দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পাণ্ডুলিপিটি লাল কালির কাটাছেঁড়ার কাঁটাবন থেকে উদ্ধার করে দিয়েছে স্নেহাস্পদ আবু তাহের, মসউদ, ইয়ুসুফ ও ইয়াহ্য়া। ওদের জন্য প্রাণভরা দু'আ রইল।

পরিশেষে আল্লাহ্ এ অধমকে তাঁর প্রিয় হাবীবের এক মজলুম ছাহাবীর পক্ষ সমর্থনকারী হিসাবে কবূল করে নিলেই শ্রম সার্থক মনে করবো। আমীন।

আবু তাহের মেসবাহ
মাদরাসা-ই-নূরীয়া
১৫ই রমজান, ০৭ হিঃ

দ্বিতীয় প্রকাশের শুভলগ্নে

নদীর স্রোত এবং জীবনের সময় নিজস্ব গতিতেই বয়ে যায়। এটা পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য আমার, তোমার, সবার জীবনের ক্ষেত্রে।

অনুবাদগ্রন্থ 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় ...' যখন প্রথম প্রকাশ করি তখন আমার দাড়ি ছিলো কাঁচা, কলম ছিলো আরো কাঁচা। আর আজ যখন দ্বিতীয়বার প্রকাশ করছি তখন আমার দাড়ি বেশ পেকেছে, কলমটাও সামান্য 'পেকেছে'। কিন্তু 'এখন' ও 'তখন'-এর মাঝখানে হারিয়ে গেছে জীবনের মহামূল্যবান বিশটি বছর, যা আর কখনো ফিরে আসবে না। কোথায় গেলো, কীভাবে গেলো, বলতে পারি না। হিসাবের খাতা মিলাতে চাই, মিলাতে পারি না।

মনে পড়ে সেই সময়ের কথা, বইটির 'অনুবাদ-সাধনায়' যখন আমি আত্মনিমগ্ন; কাঁচা হাতে কাঁচা কলম ছিলো, কিন্তু বুকে তারুণ্যের উত্তাপ-উদ্দীপনা ছিলো। একটা দৃশ্য যেন চোখের সামনে 'জীবন্ত' ছিলো— আল্লাহ্‌র নবীর এক মজলুম ছাহাবী দাঁড়িয়ে আছেন আদালতের কাঠগড়ায়, ইতিহাসের আদালত। নির্দয় এক 'মাওলানা' মেতে উঠেছেন কলমের হামলায় তাঁকে ঘায়েল করার অপচেষ্টায়। সেই মজলুম ছাহাবীকে রক্ষার জিহাদে যারা নেমেছেন 'কলমের তলোয়ার' হাতে, আমিও শরীক হয়েছি তাদের কাফেলায়।

আজ এত বছর পর এখনো হৃদয়ের গভীরে অনুভব করি তখনকার জোশ ও জযবার অপূর্ব এক মাধুর্য! এরপর আরো কতবার কলমে আমার শব্দের তরঙ্গ জেগেছে, কিন্তু হৃদয়-সমুদ্রে তেমন জোয়ার কখনো আর জাগে নি। আহা, ঈমানিয়াতের কী মধুর প্রশান্তি ছিলো! আল্লাহ্‌র নবীর ছাহাবীর সঙ্গে একাত্মতার প্রশান্তি!

পূর্ণিমার জোসনা-স্নাত এক গভীর রাতে বইটির অনুবাদ যখন শেষ হলো; বাতির আলো নিভিয়ে, চাঁদের আলো গায়ে মেখে জানালার পাশে যখন দাঁড়ালাম, পরম প্রাপ্তির ও তৃপ্তির সেই অনির্বচনীয় মুহূর্তে মনে হলো প্রকৃতির নৈশব্দ থেকে যেন ভেসে এলো একটি অভিনন্দন—'আজকের চাঁদের এ স্নিগ্ধ

হাসি শুধু তোমারই জন্য, আজকের রাতের মিষ্টি জোসনার এ প্লাবন শুধু তোমারই জন্য!'

সেদিন একটি স্বপ্নের মাধ্যমে একটি 'পুরস্কার' পেয়েছিলাম; আজ যখন পরিমার্জিতরূপে বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করছি তখন আবার একটি স্বপ্নের মাধ্যমে একটি 'পুরস্কার' পেলাম। শোকর আলহামদু লিল্লাহ্! প্রার্থনা করি, আখেরাতের শেষ পুরস্কারও যেন লেখা থাকে এ গোনাহগার বান্দার নছীবে, আর যারা বিশ্বাস করে ছাহাবাদের চরিত্রের পবিত্রতায় এবং হৃদয় যাদের সমৃদ্ধ ছাহাবাদের প্রতি ভালোবাসায় ও ভক্তি-শ্রদ্ধায়, তাদেরও নছীবে। আমীন!

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য শোকর, আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশের পর তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে এবং পরপর কয়েকটি মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র বহু বান্দা বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, বইটি তাদের উপকারে এসেছে, তাদের চিন্তার জগতে বহুদিনের ভ্রান্তি দূর হয়েছে এবং ছাহাবা কেরামের প্রতি মন্দ ধারণার কলঙ্ক থেকে তাদের মুক্তি ঘটেছে । অনেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আন্তরিক দু'আ জানিয়েছেন। স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে, এতে আমি যথেষ্ট পরিমাণে প্রীত ও আপ্লুত হয়েছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌র বান্দাদের নেক দু'আ হলো জীবন পথের মূল্যবান পাথেয়। আর কলম-সফরের এক দুর্বল মুসাফির হিসাবে এ পাথেয় আমার প্রয়োজন, বড় প্রয়োজন!

কোন কোন সুধী পাঠক তখন অনুরোধ করেছিলেন—মাওলানা তকী উসমানী-এর স্বনামধন্য পিতা হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ)-এর রচিত مقام صحابہ বইটি যেন অবশ্যই অনুবাদ করি। কেননা ছাহাবা কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত এবং মুকাম ও অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য এটি এক মহামূল্যবান গ্রন্থ, যা তিনি লিখেছেন কলমের কালি দিয়ে নয়, হৃদয়ের অশ্রু দিয়ে। আমারও অন্তরের নিভৃতে বহুদিন থেকে এ আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিলো। আল্লাহ্‌র শোকর, এ গোনাহগার বান্দার কলমে বইটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে।

ছাহাবা-বিষয়ে আরো কিছু আকাঙ্ক্ষা এখনো আমার হৃদয়ে ঘুমিয়ে আছে। আল্লাহ্ যেন তাওফীক দান করেন। চোখের জ্যোতি, হাতের শক্তি এবং কলমের কালি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যেন তা বাস্তবে প্রস্ফুটিত হয়। আল্লাহ্ তো সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছার সামনে সংসারের সব অসম্ভব মুহূর্তে সম্ভব হয়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়া নদীতেও ভরা জোয়ার এসে যায় এবং 'ঝরে যাওয়া' গাছেও ফুল ফুটে যায়।

বেশ কিছুদিন থেকে 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়...' বইটি 'বইমহলে' অনুপস্থিত, তাই পরিচিত-অপরিচিত বহু শুভার্থী অব্যাহতভাবে তাগাদা দিয়ে আসছিলেন, অবিলম্বে বইটির পুনর্মুদ্রণের। আমিও উদ্যোগ গ্রহণ করলাম, কিন্তু পুনঃসম্পাদনায় এত দীর্ঘ সময় ব্যয় হলো যে, 'বিলম্ব'-এর শুরুতে 'অ' যোগ করা আর সম্ভব হলো না।

লেখার কাটাছেরা ও শব্দের ঘষা-মাজা আমার বহু দিনের একটি 'প্রিয় ব্যাধি'। তাই লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং শেষ হওয়ার পরও তা চলতেই থাকে, এমন কি পিছনের লেখাও যতবার পড়ি ততবার ভাষা ও শব্দের নতুন নতুন ত্রুটি ও অসৌন্দর্য ধরা পড়ে। ফলে তাতেও লাল কালির 'বিচিত্র কারুকাজ' চলতে থাকে। তবু যেন লেখার খুঁত এবং মনের খুঁতখুঁতি দূর হয় না।

আমার ছাত্ররা লেখার প্রতি আমার 'মমতা ও নির্মমতা' দেখে অবাক হয় এবং সাধুবাদ দেয়, তবে নিজেরা তা অনুসরণ করে না। ওরা আসে, বসে এবং কলম ধরে, কিন্তু কলম 'ধরা' শেখে না, শিখতে চায়ও না। আমার শিক্ষক জীবনের এ নিদারুণ ব্যর্থতা। আমি যেন এক 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক'। থাক সে কষ্টের প্রসঙ্গ।

আলোচ্য গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও তাই হলো। সহৃদয় পাঠক 'প্রসন্নতা' প্রকাশ করলেও পুনঃসম্পাদনাকালে তাতে এত এত ত্রুটি ও অসৌন্দর্য ধরা পড়লো যে, নিজেকে নিজে লজ্জা দিয়ে বললাম, ছি! এত ভুল যার কলম থেকে 'ঝরে' তার কি কলম ধরা সাজে! তবু দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বইটির ভাষা ও শব্দের চেহারা-সুরত যথাসম্ভব 'সাফসুতরা' করার চেষ্টা করেছি। তারপরও অনেক 'কালি ও কালিমা' রয়ে গেছে নিশ্চয়!

আসলে সাহিত্যের অঙ্গনে যাদের সঙ্গে আমাদের আসল লড়াই সেই ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ 'বন্ধুদের' তুলনায় আমাদের কলম খুবই দুর্বল। আমরা কলম চালনা করি, ওরা কলম পরিচালনা করে। ওদের ভাষায় ছন্দের নূপুর-নিক্কণ, আমাদের ভাষায় ছন্দের পতন এবং 'অধঃপতন'। আল্লাহ্ জানেন, কবে দূর হবে আমাদের কলমের জড়তা ও ভাষার দুর্বলতা। কবে আমরা পারবো সাহিত্যের অঙ্গনে 'শিক্ষক' হতে এবং ওদেরকে সাহিত্যের নতুন সবক শেখাতে। আমাদের প্রিয় মাওলানা আলী নদবী মরহুম যেমন বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে ওরা হবে ইমাম, আর আপনারা মুক্তাদী, তা চলতে পারে না। এমন কলম তৈরী করুন যা এযুগের কলমজাদুগরদের সিজদায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করবে।'

হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, তবু এ ফাঁকে কথাগুলো বলে রাখলাম এ কারণে যে, আমাদের তরুণ আলিম যারা কলম হাতে নিয়েছেন, যারা লড়তে চান বাতিল সাহিত্যের বিরুদ্ধে তারা যেন আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য কলমের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহলেই তাদের লেখার কলম হতে পারে উম্মতের ব্যথার 'মলম'।

সে যাক! দীর্ঘ দিনের অপেক্ষার পর বইটির সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে পেরে আজ আমি সত্যি বড় আনন্দিত। আল্লাহ্ কবুল করুন এবং আমাদের সকলের মঙ্গল করুন। যাদের মনের আসমানে ছাহাবা কেরামের প্রতি অশ্রদ্ধার কালো মেঘ এখনো জমে আছে, আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সুবাতাস যেন তা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে দূরে, বহু দূরে। যাঁদের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি ঈমানের নূর এবং 'ইনশাল্লা' পাবো জান্নাতের হূর, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তাঁদের পিছনে তাঁদের ছায়ায় যেন দাঁড়াতে পারি রোজ হাশরে। আমীন!

আবু তাহের মিছবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
আশরাফাবাদ, ঢাকা-১৩১০
১৫-৭-২৪ হিঃ

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে

হামদ ও ছালাত

যাঁর নিখুঁত সৃষ্টিকুশলতায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এ বিশ্বজাহান; যাঁর অসীম কুদরতের অনুপম নিদর্শন এ চাঁদ-সুরুজ, এ সিতারা-আসমান; যাঁর করুণা-স্নিগ্ধ লালন-প্রতিপালনে ধন্য সকল জড়-উদ্ভিদ-প্রাণ; সেই মহান রব্বুল আলামীনেরই জন্য আমার সকাল-সন্ধ্যার হামদ-ছানা, আমার দিবস-রজনীর স্তুতি-বন্দনা।

যাঁর শুভাগমনে মানবতার পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হলো এবং জুলমাতের অন্ধকার দূর হয়ে হিদায়েতের আলো উদ্ভাসিত হলো; মানুষের মুক্তির জন্য মানুষেরই হাতে তায়েফের মাটিতে যাঁর লহু ঝরলো, অহুদের মাঠে দান্দান শহীদ হলো; উম্মতের চিন্তায় শেষ রাতের সিজদায় যাঁর আহাজারিতে আল্লাহর আরশ দুলে উঠলো; সেই নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি আমার বিরহী আত্মার দুরূদ ও সালাম, মদীনা-স্বপ্নে বিভোর আমার হৃদয়ের প্রেম ও পায়গাম।

যাঁদের শহীদি খুনে বদর-অহুদ ও য়ারমুক-কাদেসিয়ায় লেখা হলো ইসলামের বিজয় ইতিহাস; যাঁদের হিজরত-নোসরতে ঈমান ও সত্যের মশাল হলো চির অনির্বাণ, মুমূর্ষু মানবতা ফিরে পেলো নতুন প্রাণ, আর পথহারা মানব-কাফেলা পেলো হেরার রাজতোরণের সন্ধান; সেই পুণ্যাত্মা ছাহাবাগণের প্রতি হোক আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি; তাঁদের কবর হোক নুরে-রহমতে পূর্ণ এবং করুণা ও কল্যাণ-শিশিরে সিক্ত।

পূর্বাভাস

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছাহাবীগণের মোবারক কাফেলায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব; নবী-উদ্যানের এক

সুরভিত গোলাব এবং ঈমান ও সত্যের জগতে এক জ্যোতির্ময় তারকা। দরবারে রিসালাতে অহী লিপিবদ্ধ করার সুমহান দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পুণ্যলগ্নে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কোরআন অবতরণের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত। এ মহাসৌভাগ্য ছাহাবীগণের মাহফিলে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছিলো সম্মান ও মর্যাদার স্বর্ণশিখরে, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কুসুম কাননে। জীবনসায়াহ্নের এই কুড়ানো মাণিকের জন্য আল্লাহর রাসূলও প্রাণভরে দু'আ করেছিলেন—

اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به –

'হে আল্লাহ! তাকে পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক করো এবং তার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত করো।' (তিরমিযি)

হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর তাঁর শাসনকালই ছিলো ইসলামের সোনালী ইতিহাসের উজ্জ্বলতম যুগ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন বিরাজমান ছিলো সুখ-শান্তি, স্থিতি ও নিরাপত্তা। বহিঃশত্রুর মনে ছিলো ইসলামী খিলাফতের অপ্রতিহত প্রভাব। ফলে মুসলিম জাহানের সীমান্ত পানে চোখ তুলে তাকানোর সাহস ছিলো না তাদের। কিন্তু চরম লজ্জা ও বেদনার বিষয় যে, ইসলামের মুখোশহীন ও মুখোশধারী শত্রুরা নবীজীর এই প্রিয় ছাহাবীর বিরুদ্ধে অপবাদ ও অপপ্রচারের এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ইসলামী ইতিহাসের এ স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় আজ হারিয়ে গেছে মুসলিম উম্মার দৃষ্টিপথ থেকে। এই মজলুম ছাহাবীর চরিত্রহননে এমন কোন অপকৌশল নেই যা শত্রুরা এবং 'বন্ধুরা' ব্যবহার করে নি। সম্ভবতঃ ইসলামী ইতিহাসের আর কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি ওরা এতটা নগ্ন ও হিংস্র হয় নি।

সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টিতে নবীজীর স্নেহধন্য ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র পরিচয় আজ এই যে, ক্ষমতার মসনদ ছিলো তাঁর স্বপ্ন, হত্যা ও রক্তপাত ছিলো তাঁর নেশা এবং ধোকাবাজির রাজনীতি ছিলো তাঁর পেশা। বস্তুতঃ ক্ষমতার অন্ধ মোহই তাঁকে মাতিয়ে তুলেছিলো খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে। এবং.....

প্রচারণার এই ধূম্রজালে ইসলামী উম্মাহ আজ বিস্মৃত হতে চলেছে যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠার অনন্য গৌরবের অধিকারী, যাঁর সম্পর্কে 'যবানে নবুয়ত'-এর সুসংবাদ হলো—

اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا.

আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী 'সমুদ্র-জিহাদে' যাবে তারা জান্নাতে যাবে। (বুখারী, খঃ ১, পৃঃ ৪১০)

জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো তাঁর কেটেছে রোম-এর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে এবং ইসলামী খিলাফতের সীমান্তে নাংগা তলোয়ার হাতে, আরবী ঘোড়ার পিঠে। তরবারির আঁচড় কেটে কেটে একদিকে তিনি ইসলামী খিলাফতের সবুজ মানচিত্রে যোগ করেছেন সাইপ্রাস ও রোডেসিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ড; অন্যদিকে আপন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বগুণে দ্বিধাবিভক্ত ইসলামী উম্মাহকে পুনঃঐক্যবদ্ধ করেছেন হিলালী ঝাণ্ডার ছায়াতলে।

তিনি ছিলেন ইলম ও আমলের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, ইনসাফ ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুকরণীয় আদর্শ।

এই মজলুম ছাহাবীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ-অপবাদের নিরপেক্ষ সমালোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার বাসনা বেশ কিছুদিন ধরে আমার মনে অনুরণিত হচ্ছিলো। ইত্যবসরে স্বনামখ্যাত গবেষক চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী-রচিত خلافت وملوكيت (খিলাফত ও রাজতন্ত্র) বইটি বাজারে এলো।[১] তাতে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনেছেন এবং ঘসে মেজে, নতুন সাজে পেশ করেছেন। ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের অন্তরে মাওলানা মওদূদীর লেখনী ও ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা সাধারণ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো। ফলে তাদের মাঝে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো এবং এ ধারণা একরূপ বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্রের 'গিলোটিনে' হত্যার জঘন্যতম অপরাধের প্রধান আসামী হলেন মু'আবিয়া (রাঃ)। সর্বত্র এই মজলুম ছাহাবীর বিরুদ্ধে সমালোচনার এমন ঝড় উঠলো যে, মনে হলো: খোদ শয়তানও বুঝি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের আনন্দে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছে।

এ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের মতামত ও বক্তব্যের জন্য জোর তাগাদা শুরু হলো। তখন আমি প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে বেদনাদগ্ধ হৃদয়ে কলম ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং খুব সতর্কতার সাথে আলোচ্য বইটির 'হযরত মু'আবিয়া' অংশের উপর এক বিস্তৃত সমালোচনা লিখে আমার সম্পাদিত 'আলবালাগ' সাময়িকীতে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশ করলাম।

---

১. খিলাফত ও রাজতন্ত্র নামে বইটির বাংলা তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক প্রকাশনী থেকে।

আল্লাহ পাকের শোকর: সুধী মহলে সমালোচনা-প্রবন্ধটি সমাদৃত হলো এবং অনেকের মন থেকে সন্দেহের জমাটবাঁধা মেঘ কেটে গেলো। সুহৃদ বন্ধুদের অব্যাহত অনুরোধের মুখে সেটাকেই এখন গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করছি। মূল সমালোচনার সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র জীবন ও চরিত্রের উপর একটি ইতিবাচক প্রবন্ধও সংযুক্ত করা হলো। এটি লিখেছে আমার স্নেহের ছোটভাই মাহমুদ আশরাফ। সুতরাং এ বইয়ে আপনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলোর বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য জবাব যেমন পাবেন তেমনি পাবেন তাঁর জীবন ও চরিত্রের এবং গুণ ও যোগ্যতার সমুজ্জ্বল চিত্র এবং ছাহাবাবিরোধ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও অবস্থানের প্রমাণপঞ্জী।

এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের মনের জমাটবাঁধা সংশয় সন্দেহের অবসান করুন। আমীন

মুহম্মদ তকী উসমানী
দারুল উলুম করাচী
২৭/৩/১৩৯১ হিঃ

خلافت وملوكيت

خلافت وملوكيت

الله الله فى أصحابى، لاتتخذوهم غرضا من بعدى، فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن ابغضهم فبغضى ابغضهم —

আমার ছাহাবাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করো! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। যারা তাদের ভালোবাসবে, তারা আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদের ভালোবাসবে। আর যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তারা আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

— আল হাদীছ

بسم الله الرحمن الرحيم

একটি বই— একটি ফিতনা

কয়েক বছর আগে মাওলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী 'খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত' নামে যে বই লিখেছেন সে সম্পর্কে 'আল-বালাগের' জন্মলগ্ন থেকেই অজস্র চিঠি প্রতিদিন আমাদের হাতে আসছে। দেশ-বিদেশের অনেকেই এ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান ও মতামত জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু দু'টি কারণে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা সযত্ন নীরবতা অবলম্বন করে এসেছি।

প্রথমতঃ এ ধরনের 'বিলাসী' আলোচনা আমাদের মোটেও পছন্দ নয়। কেননা আমরা আমাদের সীমিত সাধ্য ও কর্মশক্তি সেই সব বুনিয়াদী সমস্যার মোকাবেলায় নিয়োজিত রাখতে চাই, যা সামগ্রিকভাবে গোটা ইসলামী উম্মাহর অস্তিত্বের জন্য আজ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বইয়ের যে অংশটি দেশের সর্বত্র আজ নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছে তা এতই নাযুক ও সংবেদনশীল যে, সে সম্পর্কে কোন রকম আলোচনার সূত্রপাত করা বর্তমান সময়সন্ধিক্ষণে কারো জন্যই আমরা সমীচীন মনে করি না।

ছাহাবা কেরামের মোবারক জামা'আত সম্পর্কে আমাদের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, চাঁদ-সুরুজ, আসমান-যমীন তথা গোটা সৃষ্টিজগত নবী রাসূলগণের পর তাঁদের চেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ কোন দিন দেখে নি। ন্যায় ও সত্যের এ মহান কাফেলার প্রত্যেক সদস্য এমন শিশির-শুভ্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যার একটি মাত্র দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় মানুষের সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে। প্রবৃত্তির সব রকম মলিনতা থেকে তাঁদের হৃদয় ছিলো চিরমুক্তঃ নূরের তাজাল্লীতে ছিলো চিরস্নিগ্ধ। আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে বুলন্দ করার জিহাদে তাঁরা ছিলেন নিবেদিত এবং আসমানী নির্দেশের সামনে ছিলেন কৃতার্থ, অবনত। মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ তাঁদের কারো জীবনে কখনো কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে তাঁদের জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে; তাঁদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণ কী ছিলো? কোন্ পক্ষ সত্যের উপর ছিলো? এবং কখন কার কী বিচ্যুতি ঘটেছিলো? তাহলে আল-কোরআনের ভাষায় তার দ্ব্যর্থহীন জবাব—

تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون -

সেই উম্মত অতীত হয়েছে। তাদের কৃতকর্ম তাদের, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের। তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

(বাকারাহ-১১৪)

মূলতঃ এ দু'টি কারণে এ পর্যন্ত আমরা এমনকি আলোচ্য বইটির স্পর্শ থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু স্বচক্ষেই আজ দেখতে পাচ্ছি; যে মহাফিতনা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছিলো আমাদের এ সযত্ন নীরবতা; আলোচ্য 'কেতাব'টির 'আশীর্বাদ'রূপে সে ফিতনাই আজ শত জিহ্বা মেলে উম্মাহকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে এবং দেশব্যাপী বিতর্কের এক প্রলয়ংকরী ঝড় বইয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে উভয় তরফে এবাবদ বই-পুস্তক ও প্রচারপত্রের দস্তুরমত 'হিমালয়' তৈরী হয়ে গিয়েছে। মুসলমানে মুসলমানে এমন জানকবুল মসি-যুদ্ধ এর আগে সম্ভবতঃ আর কখনো ঘটে নি।

এদিকে বইটি আগাগোড়া পড়ে এবং অনেকের সাথে মতবিনিময় করে আমাদের মনে হলো; মাওলানা মওদূদীর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা নিয়ে যারা বইটি পড়েছেন, তাদের মনে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় ছাহাবাগণ সম্পর্কে মারাত্মক ভ্রান্তি বাসা বেঁধেছে, যা এখনই দূর হওয়া জরুরী। এ পরিস্থিতিতে সব রকম বাড়াবাড়ি পরিহার করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভেজাল গবেষণাধর্মী আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সত্যাসত্য তুলে ধরা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিলো না। প্রয়োজনের এ সুতীব্র অনুভূতিই বর্তমান প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট।

এ আলোচনার জন্য সতর্কতার সাথে এমন একটা সময় আমরা বেছে নিয়েছি, যখন বিতর্কের পরিবেশ মোটামুটি ঝিমিয়ে এসেছে এবং উভয় তরফের উৎসাহী যোদ্ধারা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একটা বাস্তব মীমাংসা খুঁজে পেতে চাচ্ছেন। আমাদেরও উদ্দেশ্য, বিতর্কের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তার আহ্বান

জানানো এবং অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বাস্তব সত্য অবলোকনের পথ সবার জন্য সুগম করা।

আলোচ্য বইটি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন, এমন বন্ধুদের লক্ষ্য করেই মূলতঃ এ আলোচনা। তাদের খিদমতে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো আবেদন: বিতর্কের মনোভাব বর্জন করে মতবিনিময়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে এসে প্রবন্ধটি পড়ুন। আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা করে বলা যায়; যে দরদ-অনুভূতি নিয়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে সে অনুভূতি নিয়ে তা পড়া হলে পারস্পরিক বিভেদ ও অনাস্থার বর্তমান অস্বস্তিকর পরিবেশের অবশ্যই অবসান ঘটবে। আমীন!

কেন এ আলোচনা উস্কে দেয়া হলো ?

আমাদের জন্য তো এটাই বোধগম্য নয় যে, আজকের এ ফিতনাসর্বস্ব যুগে ছাহাবা-বিরোধের মত নাযুক ও স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন্ ভরসায় কলম ধরার সাহস করা হলো? উম্মাহ বর্তমানে যেসব মৌলিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেগুলোর সফল মোকাবিলা করতে হলে সময় ও উপায়-উপকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে বিরাট কর্মযজ্ঞ আজ আমাদের আঞ্জাম দিতে হবে এবং সে জন্য যে একাগ্র প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মওদূদী সাহেব অবশ্যই আমাদের চেয়ে ভালো জানেন।

গোটা পৃথিবীর সম্পদশক্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং চিন্তাজগতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী প্রচারমাধ্যম ও প্রকাশনাসংস্থাগুলো আজ এমন সব ইসলামবিরোধী চক্রের একচেটিয়া দখলে, যারা নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ; কিংবা ঈমান ও বিশ্বাসের জগতে দাসসুলভ হীনমন্যতায় আক্রান্ত এমন সব নামধারী মুসলমানের কব্জায়, যারা পশ্চিমা মুরুব্বীদের মর্জিমাফিক ইসলামের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলেই কৃতার্থ। এমতাবস্থায় ইসলামবিরোধী চক্রের মোকাবেলায় সহায়-সম্বলহীন হকপন্থীদের পক্ষে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হতে পারে একমাত্র কার্যকর অস্ত্র। সুতরাং নিজেদের খুঁটিনাটি সাবেক মতবিরোধকেও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে আমাদের সর্বশক্তি সেসব ক্ষেত্রে নিয়োজিত করাই কি সমীচীন নয়, যেদিক থেকে ইসলামের উপর আজ কুফর ও নাস্তিকতার নগ্ন হামলা আসছে? গুরুত্বহীন ও পার্শ্ববিষয়গুলোর পরিবর্তে আমাদের মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তি এমন সব মৌলিক সমস্যার সমাধানে ব্যয় করাই কি উচিত নয়, যার উপর নির্ভর করছে আজকের ইসলামী উম্মাহর জীবন মরণের প্রশ্ন এবং মুসলিম জাহানের ভাগ্যের ফায়সালা?

এটা অবশ্যই সত্য যে, যুগের ভাষায় ইসলামী খিলাফতের নির্ভুল ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপরেখা তুলে ধরা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে, এ পর্যায়ে মাওলানা সাহেব তাঁর গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে বেশ প্রশংসনীয় প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান সময়ের দাবী পূরণের জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট ছিলো যে, ইসলামী খিলাফতের রূপরেখা কী? খিলাফত কায়েমের পথ ও পন্থা কী? এবং প্রশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার তথা শাসক ও শাসিতের মাঝে সম্পর্কের বুনিয়াদ ও প্রকৃতিই বা সেখানে কী? পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে খিলাফত কীভাবে রাজতন্ত্রের রূপ নিলো এবং সে অপরাধের দায়-দায়িত্ব কার কতটুকু—এটা নিরেট ঐতিহাসিক আলোচনা মাত্র। উম্মাহর বর্তমান সময়সন্ধিক্ষণে এ নিয়ে দস্তুরমত গবেষণায় ডুব দেয়া 'বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাস' হতে পারে, ইসলামের সেবা হতে পারে না। কেননা আজকের মুসলমানদের বিশেষ কোন স্বার্থ ও কল্যাণের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত নয়। তাছাড়া এমন তো নয় যে, অতীতে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই হয় নি, যার ফলে ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টিকটু কোন শূন্যতা রয়ে গেছে। কম করে হলেও আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে আল্লামা ইবনে খালদুনের মত জগদ্বরেণ্য ঐতিহাসিক পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও কুশলতার সাথে সে শূন্যতা পূরণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'আলমুকাদ্দিমা'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' সম্পর্কে বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সে অধ্যায়ের ছাব্বিশতম অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন—

في انقلاب الخلافة الى الملك

খিলাফতের রাজতান্ত্রিক রূপান্তর

ইবনে খালদুন তাঁর স্বভাবসুলভ মার্জিত ও সংযত ভাষায় এ রূপান্তরের প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ও চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে আল্লামা ইবনে খালদুনের যে সুগভীর নজর ছিলো; জানি না কেউ আজ তাঁর সমকক্ষতা দাবী করেন কি না। মুসলিম-অমুসলিম সকল ঐতিহাসিকই ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শনের আসরে তাঁর 'পৌরহিত্য' স্বীকার করে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর চিন্তাধারাসম্বলিত 'আল-মুকাদ্দিমা'-এর তরজমাও তারা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন। আল-মুকাদ্দিমার সে আলোচনায় মর্মান্তিক ছাহাবা-বিরোধের খুনদরিয়া আল্লামা ইবনে খালদুন বেশ নিরাপদেই পাড়ি দিয়ে এসেছেন।

সুতরাং আজকের এ নাযুক সময়ে অতীতের একটি মীমাংসিত বিষয়ে 'কলম খোঁচানো' আমাদের মতে নেবু কাড্‌নেজারের জেরুজালেম আক্রমণকালে ইহুদী পণ্ডিতদের জানকবুল বাকযুদ্ধের মতই হাস্যকর এবং তাতারী হামলাকালে আলী-মু'আবিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বাগদাদী উলামাদের 'মোরগ লড়াই'য়ের মতই দুঃখজনক।

মাওলানা মওদূদী অবশ্য এ আলোচনা শুরু করার স্বপক্ষে একটা অজুহাত খাড়া করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ছে। এই সেদিন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এম. এ ক্লাসের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে; আল-কোরআনের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কী? এবং নবুয়তের আমলে সে নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে ঘটেছে? ইসলামী খিলাফতের রূপরেখা কী? এবং কেমন করে এ মহান প্রতিষ্ঠানটির রাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছে?

এখন আপত্তিকারী মহোদয়রা কি এটাই চান যে, মুসলিম ছাত্ররা এসব প্রশ্নের উত্তরে পাশ্চাত্য লেখকদের উপস্থাপিত তথ্যই হজম করবে, কিংবা অপর্যাপ্ত অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং তাদের প্রতারণার সহজ শিকার হবে, যারা শুধু ইতিহাসকে নয় বরং ইসলামী খিলাফতের ধারণাকেও বিকৃত করার অপচেষ্টায় আজ মাঠে নেমেছে?'

(খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত, পৃঃ ৩০০)

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মারমুখী বিতর্কের পরিবেশ থেকে সরে এসে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলে মাওলানা সাহেব নিজেই 'সমঝতে' পারতেন, তাঁর অজুহাত কতটা রুগ্ন ও কংকালসার। কেন? আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে ইবনে খালদুন যে জবাব দিয়ে গেছেন সেটাই তো আজকের মুসলিম ছাত্ররা দিতে পারে! আল-মুকাদ্দিমার তরজমা তো তাদের পাঠ্যসূচীতেই রয়েছে! বলাবাহুল্য যে, কারো ঘাড়ে আত্মহত্যার ভূত সওয়ার হলেই শুধু তার মাথায় ইবনে খালদুনের নিরাপদ আস্তানা ছেড়ে পশ্চিমা লেখকদের কাঁটাবনে ঢোকার দুর্বুদ্ধি চাপতে পারে। আর সে ভূত একবার কারো ঘাড়ে চেপে বসলে হাজারটা গবেষণা গ্রন্থের 'ঝাড় ফুঁকে'ও তা ছাড়ানো সম্ভব নয়।

মাওলানা সাহেবের এ বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ যে, যদি আমরা নির্ভুল, যুক্তিনির্ভর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস বিন্যস্ত না করি, যদি সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক ফলাফল আহরণ করে দুনিয়ার সামনে তুলে না ধরি, তাহলে সুযোগ-সন্ধানী পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এবং

বিকৃতমস্তিষ্ক মুসলিম লেখকরা ইসলামী উম্মাহর নতুন প্রজন্মের মন-মগজে ইসলামের ইতিহাস থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবন-বিধান সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দেবে। (খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত, পৃঃ ৩০০)

মাওলানা মওদূদী এখানে দু'টি খতরা জাহির করেছেন। প্রথমতঃ ইতিহাস বিকৃতকারীরা আমাদের নীরবতার চোরাপথে নতুন প্রজন্মের মন-মগজে ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দেবে। দ্বিতীয়তঃ এভাবে খোদ ইসলামী ইতিহাস বিকৃতির শিকার হবে।

প্রথম খতরা বাবদ আমাদের বক্তব্য হলো; কোন পণ্ডিতমূর্খ যদি আমাদের ইতিহাসের আয়নায় ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থার চেহারা দেখার বোকামি করে তাহলে মুখের উপর তাকে আমরা বলে দেবো যে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনবিধানের বুনিয়াদ ইতিহাসের সস্তা ঘটনাপঞ্জী নয়; এর বুনিয়াদ হলো কোরআন ও (বিচার বিশ্লেষণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সুন্নাহ। সুতরাং আমাদের জীবন ও জীবনব্যবস্থা বুঝতে হলে কষ্ট করে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহশাস্ত্র থেকেই তোমাকে তা বুঝতে হবে।

খোদ মাওলানা মওদূদীও স্বীকার করেন যে, হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব, মাকরূহ, মুস্তাহাব ও সুন্নাত-বেদ'আত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তী বিষয়গুলোর মীমাংসা ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাবিবরণী দ্বারা হতে পারে না। এ-ই যদি হয় তাহলে ইসলামী জীবনব্যবস্থাসম্পর্কিত ভুল ধারণার অবসানের নামে কেন আমরা বোকার মত প্রতিপক্ষের স্বেচ্ছা-ভ্রান্তিরই পুনরাবৃত্তি করতে যাই? নিজেদের জীবনব্যবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য কোরআন-সুন্নাহর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের পরিবর্তে কোন্ আক্কেলে নিজেরাই আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার আন্ধা গলিতে ঘুরে মরি?

মাওলানার দ্বিতীয় খতরা হলো; যদি আমরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে নিজেদের নির্ভুল ইতিহাস তুলে না ধরি, তাহলে প্রতিপক্ষ সেই চোরাপথে আমাদের নতুন প্রজন্মের মনমগজে ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দেবে।

এটা অবশ্য সত্য কথা। তবে যথাযোগ্য বিনয়ের সাথে মাওলানার খিদমতে আমাদের নিবেদন, ইসলামী ইতিহাসের যে কালো চিত্র এবং ছাহাবা-তাবেয়ীনদের যে কলঙ্কিত চরিত্র আপনার 'হাজ্জাজী কলম'[১] তুলে ধরেছে, শত্রুরা

১. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তলোয়ার যেমন ইসলামী উম্মাহর লাভ ক্ষতি দুই-ই করেছে, তেমনি মাওলানা মওদূদীর ক্ষুরধার লেখনী ....।

এর চেয়ে খারাপটা কী করবে শুনি! তাছাড়া এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ কি 'চিনিপাতা দইয়ের' মত অত সহজেই আঞ্জাম দেয়া সম্ভব? নিজেদের ইতিহাস ও অতীত সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা আশ্বস্ত করতে চাই তাহলে ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে কতগুলো একতরফা বর্ণনা জড়ো করে দিলেই খুব একটা চিড়ে ভিজবে বলে মনে করার কারণ নেই। প্রথমে আমাদেরকে বরং কতগুলো সুনির্দিষ্ট মূলনীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সে আলোকে পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর একটিকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে হবে। অন্যথায় বলাই বাহুল্য যে, তাবারী, ইবনে কাছীর ও ইবনুল আছীরের বরাত টেনে আপনি ঘটনার একটি পরম্পরা খাড়া করলে অন্যরা একই উৎসগ্রন্থের বরাত টেনে বিপরীত পরম্পরা দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারবে অনায়াসে। এভাবে ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ফেলে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আরো বিপথগামী করা ছাড়া আর কী মহৎ কর্মটা হবে?

সুতরাং আমাদের সুচিন্তিত মতামত এই যে, সাধারণভাবে ইসলামী ইতিহাস এবং বিশেষভাবে ছাহাবাবিরোধের জটিল ও মর্মান্তিক ইতিহাস সম্পর্কে নিত্য নতুন গবেষণার বিলাসী মানসিকতা পরিহার করে চলাটাই এ ফিতনাপূর্ণ যুগে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেননা এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বহু সমস্যাই আমাদের সামনে আজো অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। নিদেন পক্ষে আমাদের উচিত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ আলিমদের একটি নির্বাচিত মজলিসের হাতে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা এবং ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণের মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক আলিমের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভ করা। কেননা এ ক্ষেত্রের যে কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মুসলিম উম্মাহকে গৃহবিবাদের আরেকটি নতুন ক্ষেত্র সরবরাহ করা ছাড়া বিশেষ কোন অবদান রাখতে সক্ষম হবে না।

মোটকথা; ইবনে খালদুনের মত বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসগ্রন্থসমূহ মন্থন করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তদুপরি কোন পণ্ডিত মহোদয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ঝুঁকি নিতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইবনে খালদুনের গবেষণাকর্মকেই ভিত্তি করে বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের পথে এগুতে হবে। মুসলিম উম্মাহর চৌদ্দশ বছরের স্বীকৃত সত্যের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ আলাদা 'গবেষণা' নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা কিছুতেই বুদ্ধিসম্মত কাজ হবে না। কেননা এতে চিন্তার জগতে নৈরাজ্যই শুধু বৃদ্ধি পাবে এবং বিভেদ বিভক্তির ফাটল শুধু প্রশস্ততর হবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আসুন এবার আমরা 'খিলাফত ওয়া মলূকিয়াত' গ্রন্থের মূল সমালোচনায় অগ্রসর হই। গ্রন্থের পরিশিষ্টে মাওলানা মওদূদী সাহেব ছাহাবা কেরামের 'আদালত' ও বিশ্বস্ততা এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার মানদণ্ড ও মর্যাদাসম্পর্কিত যে তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করার আগে আমরা মজলুম ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে আরোপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলোর তদন্ত সম্পন্ন করে নিতে চাই। কেননা, 'খেলাফত ওয়া মুলূকিয়াত'-এর অধিকাংশ পাঠকই মাওলানার প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিয়ে বইটি পড়েছেন। তদুপরি তাদের পক্ষে মূল উৎসগ্রন্থ ঘেঁটে উপস্থাপিত বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা সহজ নয়। তাই সম্ভবতঃ তারা মাওলানার বিশ্বস্ততার উপর ভরসা করে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে সে ধারণাই বদ্ধমূল করে নিয়েছেন, যা 'তিনি' তাদের দিতে চেয়েছেন। এ অবস্থায় অভিযোগের তদন্ত ছাড়া ছাহাবাদের 'আদালত' ও বিশ্বস্ততার তাত্ত্বিক আলোচনা তাদের মনে কোন রেখাপাত করবে বলে মনে হয় না।

বিভিন্ন কারণে বইটির 'সমগ্র সমালোচনা' আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বরং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) পর্যন্তই আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। কেননা হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে মাওলানার বর্ণনাভঙ্গি আপত্তিজনক হলেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র সীমানায় এসেই তাঁর কলম অমার্জনীয় বেপরোয়া আচরণ করেছে।

আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা; আল্লাহ পাক তাঁকে বিষয়টির গুরুতরতা উপলব্ধি করার এবং সঠিক পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। এ কোমল অনুভূতিতে পরিচালিত হয়েই একটি অপ্রিয় আলোচনায় আজ কলম ধরতে হলো। সুপ্রিয় পাঠকবর্গের খিদমতে আরেকবার আমরা আবেদন করবো; বিতর্কের পরিবেশ থেকে সরে এসে প্রশান্ত চিত্তে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্য পড়ুন এবং (অন্তত আজকের জন্য) সব রকমের দলীয় সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিপ্রীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করুন। কেননা বিষয়টি আল্লাহর প্রিয় হাবীবের এক প্রিয় ছাহাবীকে কেন্দ্র করে। সুতরাং তা খুবই নাযুক, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। আশা করি, এ দরদপূর্ণ আবেদন আপনাদের কোমল হৃদয়ের সূক্ষ্ম বীণায় ঝংকার তুলতে সক্ষম হবে। আমীন!

মওদূদীর অভিযোগ আমাদের জবাব

প্রথম অভিযোগ

হযরত মু'আবিয়া বিদ'আত জারি করেছেন (!)

'আইনের শাসন বিলোপ' শিরোনামে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন—

'এই বাদশাহদের রাজনীতি দ্বীনের অনুগত ছিলো না এবং হালাল-হারামের কোন তমিজ ছিল না। রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বৈধাবৈধ সব পন্থাই তারা অবলম্বন করতেন। বিভিন্ন উমাইয়া খলীফার শাসনকালে আইনের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ কী ছিলো এখানে আমরা তা আলোচনা করবো।

বস্তুতঃ হযরত মু'আবিয়ার শাসনামলেই এ 'পলিসি'র সূত্রপাত ঘটেছিলো।'

এ দাবীর স্বপক্ষে মাওলানা সাহেব মোট ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য—

'ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত (শরীয়তি বিধান) মোতাবেক কাফির ও মুসলমান পরস্পরের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খলিফা হয়ে এ 'বিদ'আত' বলিুপ্ত করলেন, কিন্তু হিশাম বিন আব্দুল মালিক খলীফা হয়ে নিজেদের খান্দানী প্রথা পুনরুজ্জীবিত করলেন।'

এ অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের উৎসগ্রন্থ البداية والنهاية-এর বরাত দিয়েছেন। সুতরাং প্রথমে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন—

حدثنی الزهری قال : كان لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فی عهد
رسول الله صلی الله عليه وسلم وابی بكر وعمر (رض) وعثمان (رض)
وعلی (رض) فلما ولی الخلافة معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث
الكافر من المسلم واخذ بذلك الخلفاء من بعده فلما قام عمر بن عبد العزيز

راجع السنة الاولى وتبعه فى ذلك يزيد ابن عبد الملك، فلما قام هشام اخذ بسنة الخلفاء يعنى انه ورث المسلم من الكافر ـ

'ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমান ও কাফির পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতো না। পরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী না করলেও মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। পরবর্তী খলিফাগণ সে ধারা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী 'সুন্নত'টি পুনর্বহাল করলেন। পরবর্তী খলিফা ইয়াযীদ বিন আব্দুল মালিকও তাঁর অনুসরণ করলেন। কিন্তু খলিফা হিশাম আবার পূর্ববর্তী খলীফাদের 'সুন্নত' গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ মুসলমানকে তিনি কাফিরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন।' (আল বিদায়া ওয়া নিহায়াহ খঃ ৯ পৃঃ ২৩২, প্রকাশকঃ মাকতাবাতুস সা'আদ)

এবার আসল সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করুন। মূলতঃ এটা হলো ফিকাহশাস্ত্রের একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা। ছাহাবাগণের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো। হানাফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) লিখেছেন—

واما المسلم فهل يرث من الكافر ام لا فقالت عامة الصحابة رضى الله تعالى عنهم لايرث، وبه اخذ علماؤنا والشافعى (رح) وهذا استحسان، والقياس ان يرث وهو قول معاذ بن جبل (رض) ومعاوية بن ابى سفيان (رض) وبه اخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على ابن حسين ـ

'গরিষ্ঠসংখ্যক ছাহাবার মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হানাফী উলামা ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ মত গ্রহণ করেছেন। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। পক্ষান্তরে হযরত মু'আয বিন জাবাল ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মাযহাব মতে মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকার পাবে। সাধারণ কিয়াসের দাবী অবশ্য তাই। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম মসরূক, হাসান বছরী, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসায়ন প্রমুখ এ মতের অনুসারী।'

(উমদাতুল কারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৬০, অধ্যায়ঃ মুসলিম-কাফির উত্তরাধিকার)

শাফেয়ী মাযহাবের হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন—

اخرج ابن ابى شيبة عن طريق عبد الله بن معقل قال مارأيت قضاء احسن من قضاء قضى به معاوية، نرث اهل الكتاب ولايرثوننا كما يحل النكاح فيهم ولايحل لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى واسحاق ـ

'ইবনে আবী শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মা'কিলের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, আর কোন সিদ্ধান্ত আমার কাছে হযরত মু'আবিয়ার এ সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম মনে হয় নি যে, আমরা আহলে কিতাবের উত্তরাধিকারী হবো, কিন্তু ওরা আমাদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। যেমন ওদের নারীদের আমরা বিবাহ করতে পারি, অথচ ওরা তা পারে না। ইমাম ইসহাক প্রমুখ এ মতের অনুসারী।'

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁর ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মাযহাবের স্বপক্ষে এক মযবুত দলিল।

الاسلام يزيد ولاينقص، اخرجه ابوداود وصححه الحاكم ـ

ইসলাম বৃদ্ধি করে, হ্রাস করে না। (সুতরাং ইসলামের কারণে কেউ মীরাছ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।) ইমাম আবু দাউদ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হাকীম তা 'সহী' বলে রায় দিয়েছেন।

(ফাতহুল বারী, খঃ ১২ পৃঃ ৪১, অধ্যায়ঃ মুসলিম-কাফির উত্তরাধিকার)

মাওলানা মওদূদী সাহেবের বর্ণনায় এমনকি সচেতন পাঠকও ভাবতে পারেন যে, এটা হযরত মু'আবিয়ার একক সিদ্ধান্ত এবং (আল্লাহ না করুন) ইজতিহাদের ভিত্তিতে নয়, বরং নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে একটি বিদ'আত জারীর মাধ্যমে তিনি আইনের মর্যাদা লুণ্ঠিত করেছেন। অথচ এই মাত্র আপনি দেখে এলেন, এটি ফিকাহশাস্ত্রের ইজতিহাদভিত্তিক একটি মাসআলা মাত্র। তদুপরি বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)ও এ বিষয়ে একমত পোষণ করতেন। আর তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ হলো—

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ـ

হালাল-হারামের ব্যাপারে ছাহাবাদের মাঝে মু'আয বিন জাবাল বেশী জানে। (মিশকাত, বাবুল মানাকিব, তিরমিযি শরীফ, বাবুল মানাকিব)।

তদ্রূপ এ মত পোষণকারীদের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন ইমাম মাসরূক, ইমাম হাসান বছরী, ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী, ইমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসায়নের মত বিশিষ্ট তাবেয়ী। সর্বোপরি তাঁদের ইজতিহাদের ভিত্তি হচ্ছে একটি সহী হাদীছ।

এটা ঠিক যে, পরবর্তী যুগের ফকীহগণ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মাযহাব গ্রহণ করেন নি। আমরাও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে নই। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মু'আবিয়া (রাঃ)-র ইজতিহাদকে বিদ'আত বলার অধিকার নেই কোন 'ভদ্রলোকের'। অধিকার নেই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনের যে, হালাল-হারামের তফাত মিটিয়ে দিয়ে ধর্মহীন রাজনীতির 'পলিসি' তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-র সাথে রাজনৈতিক মতানৈক্যের 'অপরাধে' আল্লাহর রাসূলের প্রিয় ছাহাবীকে ইজতিহাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে শাস্তি মাওলানা সাহেব দিলেন তার যৌক্তিকতা হযম করা আমাদের মত উম্মী লোকের পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়।

মাওলানার হয়ত জানা নেই যে, ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ) যেমন সুদক্ষ শাসক ছিলেন তেমনি উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুজতাহিদও ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিন্তু তা জানতেন। বুখারী শরীফ কী বলে দেখুন—

قيل لابن عباس هل لك فى امير المؤمنين معاوية ؟ ما اوتر الا بواحدة قال: اصاب انه فقيه ـ

'হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো; আমীরুল মুমিনীন মু'আবিয়া এক রাক'আত বিতর পড়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? উত্তরে তিনি বললেন, ঠিকই করেছেন। তিনি তো একজন ফকীহ।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হযরত মু'আবিয়া অধ্যায়)

মজার ব্যাপার এই যে, মাওলানা সাহেব যার মন্তব্যের ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়েছেন সেই ইমাম যুহরীও কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে (তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও) 'বিদআত' বলেন নি; বলেছেন—

فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة الاولى ـ

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খলিফা হয়ে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করলেন।

এখানে 'পূর্ববর্তী সুন্নত' কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী সিদ্ধান্তটিও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খলিফা হয়ে পরবর্তী সুন্নতের স্থলে পূর্ববর্তী সুন্নত পুনর্বহাল করেছিলেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়; মাওলানা মওদূদীর মত দায়িত্বশীল লেখক উপরোক্ত বাক্যের তরজমা করেছেন— 'হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খলিফা হয়ে এ 'বিদআত' খতম করলেন।' (পৃঃ ১৭৩)

এতবড় 'ভুল' কি কারো ইচ্ছার অগোচরে হতে পারে? তাই শুধু বলতেই চাই; আমরা মর্মাহত।

দ্বিতীয় অভিযোগ

দিয়তের অর্থ আত্মসাৎ

এ সংগীন অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য মাওলানা সাহেব লিখেছেন—

'হাফেজ ইবনে কাছির বলেন, দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মু'আবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন।

সুন্নত মুতাবেক চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের (যিম্মির) দিয়ত বা রক্তপণ মুসলমানের বরাবর হওয়ার কথা। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া তা অর্ধেকে নামিয়ে এনে বাকি অর্ধেক নিজেই নেয়া শুরু করলেন।' (পৃঃ ১৭৩-৭৪)

আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি দেখুন—

وبه قال الزهرى : ومضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم وكان معاوية اول من قصرها الى النصف واخذ النصف لنفسه ـ

'একই সূত্রে ইমাম যুহরীর বক্তব্য আমরা পেয়েছি যে, সুন্নত ছিলো এই— চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়ত মুসলমানের বরাবর হবে। হযরত মু'আবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি তা অর্ধেকে হ্রাস করে বাকি অর্ধেক নিজের জন্যে নেয়া শুরু করলেন।' (খঃ ৮ পৃঃ ১৩৯)

শুরুতেই আমাদেরকে দু'টো সংশোধনী দিতে হচ্ছে। প্রথমতঃ 'দিয়তের ক্ষেত্রেও হযরত মু'আবিয়া সুন্নতে হস্তক্ষেপ করেছেন' বাক্যটা মাওলানা সাহেবের নিজস্ব সংযোজন। ইবনে কাছীর কিংবা ইমাম যুহরী কেউ এ কথা বলেন নি।

দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ মন্তব্যটা ইবনে কাছীরের নয়; বরং ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে তিনি তা বর্ণনা করেছেন মাত্র। وبه قال الزهرى অংশটি দ্ব্যর্থহীনভাবে সে কথাই প্রমাণ করে। অথচ মাওলানা সাহেব এটাকে ইবনে কাছীরের মন্তব্যরূপে বিবৃত করেছেন। সম্ভবতঃ এটা বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিপন্থী, যা কোন দায়িত্বশীল গবেষকের পক্ষে শোভনীয় নয়।

যাই হোক, মাওলানা সাহেব ইমাম যুহরীর শেষোক্ত বাক্য اخذ لنفسه-এর তরজমা করেছেন, 'আর বাকিটা তিনি নিজেই নেয়া শুরু করলেন।' কিন্তু তিনি যদি দয়া করে যে কোন প্রামাণ্য হাদীছগ্রন্থ খুলে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন তাহলে এ ধরনের সহজ ভ্রান্তির শিকার তিনি হতেন না এবং আল্লাহর রাসূলের ছাহাবীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মত সংগীন অভিযোগ উত্থাপনেরও প্রয়োজন দেখা দিতো না। কিন্তু তিনি তা করেন নি। দেখুন; বায়হাকী শরীফে ইমাম যুহরীর বর্ণনা এভাবে এসেছে—

والقى النصف فى بيت المال ـ

'বাকি অর্ধেক তিনি বাইতুল মালে জমা করলেন।' (খঃ ৮, পৃঃ ১০২ প্রকাশক দাইরাতুল মাআরিফ, উসমানিয়া, হায়দারাবাদ)

সুতরাং اخذ لنفسه কথাটার অর্থ হলো; তিনি তাঁর দায়িত্বে অর্পিত বাইতুল মালের জন্যে নেয়া শুরু করলেন, ব্যক্তিগত খরচের জন্যে নয়।[১]

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, এ বিষয়ে দু'ধরনের হাদীছ রয়েছে। ফলে ছাহাবাদের মাঝেও বিষয়টি বিরোধপূর্ণ ছিলো। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে—

عقل الكافر نصف دية المسلم ـ

কাফিরের দিয়ত হবে মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও নায়লুল আওতার, খঃ ৭ পৃঃ ৬৪ উসমানিয়া প্রকাশনালয়।)

এ হাদীছের আলোকে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয ও ইমাম মালিক (রহঃ) অমুসলিম যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অর্ধেক বলে মত প্রকাশ করেছেন। (নায়লুল আওতার, খঃ ৭৬৫, বিদায়াতুল মুজতাহিদ খঃ ২ পৃঃ ৪১৪।)

পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর-বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে—

دية ذمى دية مسلم ـ

যিম্মির দিয়ত মুসলিম দিয়তের অনুরূপ। (বায়হাকী খঃ ৮ পৃঃ ১০২)

---

১. সুতরাং আমরা বলতে চাই, মাওলানা মওদূদী 'বেনযীর' লেখক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর লেখা সকলের পড়ার মত নয় এবং 'চোখ বুজে' পড়ার মত নয়।

এ হাদীছের সূত্র ধরেই ইমাম আবু হানিফা ও ইমা সুফয়ান ছাওরী (রহঃ) যিম্মী-মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন দিয়তের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

(নায়লুল আওতার, খঃ ৭ পৃঃ ৬৫)

কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) উভয় হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে অর্ধেক দিয়ত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পাবে; বাকি অর্ধেক জমা হবে বাইতুল মালে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজেই বলেছেন—

'নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি (যিযিয়া কর থেকে বঞ্চিত হয়ে) বাইতুল মালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং দিয়তের অর্ধেক (পঁচিশ দীনার) উত্তরাধিকারীদের দিয়ে বাকি অর্ধেক বাইতুল মালে জমা করো।'

(বায়হাকী খঃ ৮ পৃঃ ১০২-৩)

প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণের অধিকার একজন মুজতাহিদের অবশ্যই আছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যে প্রশংসনীয় সূক্ষ্মধর্মিতার সাথে বিপরীত দু'টি হাদীসের মাঝে তিনি সমন্বয় সাধন করেছেন তা হাদীছ ও ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। অথচ এই অনুপম ইজতিহাদকেই মাওলানা সাহেব হারাম-হালালের তফাত ও আইনের শাসন বিলুপ্ত করার 'পলিসি' প্রমাণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর-নির্মাতা ছাহাবীর ভাগ্যে আজ তেরশ বছর বাদে এ পুরস্কারই জুটলো মুসলিম জাহানের 'স্বনামধন্য' এই 'গবেষকের' হাতে।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে, ইমাম যুহরী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কেই দিয়তের বিধানে পরিবর্তনসাধনকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দু'টি বিপরীতমুখী হাদীছের আলোচনা তো এইমাত্র হলো। হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কেও পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়েত মতে তাঁদের আমলে যিম্মির দিয়ত ছিলো মুসলিম দিয়তের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন।

(নায়লুল আওতার, খঃ ৭ পৃঃ ৬৫ ও বিদায়াতুল মুজতাহিদ খঃ ২ পৃঃ ৪১৪)

তৃতীয় অভিযোগ

গনীমতের অর্থ আত্মসাৎ

মাওলানা মওদূদীকে আল্লাহ মাফ করুন, উপরের গুরুতর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

'গনীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কোরআন-সুন্নাহর সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ জমা হবে বাইতুল মালে এবং অবশিষ্ট মাল তকসীম হবে মুজাহিদদের মাঝে। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) গনীমতলব্ধ সোনা-চাঁদি তাঁর জন্য পৃথক রেখে অবশিষ্ট মাল শরীয়ত মুতাবেক তকসীম করার নির্দেশ জারী করলেন।'

এ অভিযোগের সমর্থনে মাওলানা সাহেব মোট পাঁচটি উৎসগ্রন্থের বরাত টেনেছেন। তন্মধ্যে পঞ্চমটি হলো আল বিদায়া ওয়া নিহায়া (খঃ ৮ পৃঃ ২৯)। এখানে আমরা আল বিদায়ার মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—

وفى هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الاسل عن امر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم اموالا جمة، فكتب اليه زياد : ان امير المؤمنين قد جاء كتابه ان يصطفى له كل صفراء وبيضاء ـ يعنى الذهب والفضة ـ يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال فكتب الحكم بن عمرو ان كتاب الله مقدم على كتاب امير المؤمنين ، وانه والله لو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتقى الله يجعل له مخرجا ـ ثم نادى فى الناس ان اغدوا على قسم غنيمتكم فقسمها بينهم وخالف زيادا فيما كتب اليه عن معاوية وعزل الخمس كما امر الله ورسوله ـ

'এ বছরই যিয়াদের নির্দেশে তার অধীনস্থ হযরত হাকাম বিন আমর খোরাসানের 'জাবাল আল-আসল' অঞ্চলে জিহাদ পরিচালনা করলেন। তাতে বিপুল শত্রু নিহত হলো এবং বিপুল সম্পদ হস্তগত হলো। যিয়াদ তখন হযরত হাকাম বিন আমরকে লিখে জানালেন, 'আমীরুল মুমিনীনের চিঠি এসেছে, যেন যাবতীয় সোনা-চাঁদি তার জন্যে আলাদা রেখে দেয়া হয়। এগুলো বাইতুল মালে জমা হবে।' উত্তরে হযরত হাকাম বিন আমর লিখে পাঠালেন। 'আমীরুল মুমিনীনের চেয়ে আল্লাহর নির্দেশই বড়। আল্লাহর কসম! আসমান যমিন যদি কারো দুশমন হয়ে যায়, আর সে শুধু আল্লাহকেই ভয় করে তাহলে তার জন্য আল্লাহ কোন না কোন উপায় অবশ্যই করে দেবেন, অতঃপর সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে) তিনি বললেন, 'গনীমতের মাল তোমরা তকসীম করে ফেলো।'

মোটকথা, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নামে যিয়াদ তাঁর কাছে যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তিনি তা অগ্রাহ্য করে শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রেখে বাকিটা মুজাহিদদের মাঝে তকসীম করে দিলেন।

এখানে মাওলানা মওদূদী কতটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন সে বিচার-ভার রইলো পাঠকের হাতে। আমরা শুধু আল-বিদায়ার উদ্ধৃতি ও মাওলানার বক্তব্যের মাঝে অত্যন্ত নগ্নভাবে যে কয়টি পার্থক্য ধরা পড়ে তা তুলে ধরছি; আল-বিদায়ার মতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজের জন্যে নয়, বরং বাইতুল মালের জন্যেই এ নির্দেশ জারী করেছিলেন। হাফেজ ইবনে কাছীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন—

يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال -

এই গনীমতের যাবতীয় সোনা-চাঁদি বাইতুল মালে জমা করা হবে। অথচ ইবনে কাছীরের বরাত টেনেই মাওলানা হুজুর লিখেছেন—

'হযরত মু'আবিয়া গনীমতের সোনা-চাঁদি তার নিজের জন্য পৃথক করে রাখার নির্দেশ জারী করলেন।'

আমরা সত্যি হতবুদ্ধি; এ ধরনের নগ্ন গরমিলের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? সংযত ভাষায় শুধু বলা যায়, 'গবেষণা' এমন অসতর্ক মানুষের জন্য নয়।

মাওলানার বক্তব্য থেকে মনে হয়, প্রদত্ত বরাতগ্রন্থগুলোতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ দেখেই বুঝি তিনি এমন

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন। অথচ আল-বেদায়াসহ কোথাও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র প্রত্যক্ষ নির্দেশের কোন উল্লেখ নেই। ইতিহাস আমাদের শুধু এইটুকু বলে যে, যিয়াদ তার অধীনস্থকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র নাম ব্যবহার করে নির্দেশ পাঠিয়েছিলো। সত্যি সত্যি এ বিষয়ে হযরত মু'আবিয়ার কোন নির্দেশ ছিলো কি না? সে নির্দেশের ভাষা কী ছিলো? উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো, সে সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নেয়া গেলো; হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হয়ত কোন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন এবং যিয়াদও সে নির্দেশের শব্দ, ভাষা ও উদ্দেশ্য অনুসরণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা রক্ষা করেছিলো। কিন্তু তারপরও এমন তো হতে পারে যে, বাইতুল মালে তখন সোনা-চাঁদির ঘাটতি ছিলো এবং কোন সূত্রে আমীরুল মুমিনীন জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত জিহাদের সোনা-চাঁদি মোট গনীমতের এক পঞ্চমাংশের অধিক নয়; তাই তিনি বাইতুল মালের ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যান্য সামগ্রীর পরিবর্তে শুধু সোনা-চাঁদি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত হাকাম বিন আমরের ক্ষোভ প্রকাশের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত গনীমতের সোনা-চাঁদি এক পশচমাংশর অধিক ছিলো। ফলে যিয়াদের মাধ্যমে প্রাপ্ত উক্ত নির্দেশ তাঁর কাছে কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী মনে হয়েছিলো।

মোটকথা, এ অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ঐতিহাসিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্য অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। এবার আপনি নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলুন, আজ তেরশ বছর পর ইতিহাসের নীরবতা উপেক্ষা করে এবং যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাশ কাটিয়ে কেন আমরা ছাহাবা-চরিত্রে এমন জঘন্য কলঙ্ক লেপন করতে যাই?

সর্বোপরি এটা ছিলো বিশেষ এক ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের সাময়িক নির্দেশ মাত্র। অথচ মাওলানার মন্তব্য পড়ে মনে হবে; বুঝি বা এটা জিহাদ ও গনীমত-বিষয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নীতিনির্ধারণী নির্দেশ। আর তাই মাওলানা মন্তব্য ছুঁড়েছেন যে, গনীমতের মাল তকসীমের ক্ষেত্রেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মহীন রাজনীতির গোড়াপত্তন করেছেন।

মাওলানার সর্বশেষ ত্রুটি এই যে, হযরত মু'আরিয়ার নামযুক্ত নির্দেশটি তিনি উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সে নির্দেশ পালিত হয়েছিলো কি না সে কথা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। অথচ একই বর্ণনার শেষাংশে হাফেজ ইবনে কাছীর সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—

وخالف زيادا فيما كتب اليه عن معاوية ـ

হযরত মু'আবিয়ার নামযুক্ত নির্দেশের ব্যাপারে তিনি যিয়াদকে অমান্য করলেন।[১]

১. দেখুন; ইবনে কাছীর বলেছেন, হযরত হাকাম যিয়াদকে অমান্য করেছেন। মু'আবিয়াকে অমান্য করেছেন— এ কথা তিনি বলেন নি। ইবনে কাছীর কেন এমনটি করলেন? মাওলানা মওদূদীও কি এই বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকু দেখাতে পারতেন না?

চতুর্থ অভিযোগ

হযরত আলীকে গালমন্দ করা

'আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত' শিরোনামে হযরত মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদীর আরেকটি অভিযোগ এই যে—

"আরো ঘৃণ্য একটি বিদ'আত হযরত মু'আবিয়ার শাসনকালে শুরু হলো। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর নির্দেশে 'সকল' আঞ্চলিক প্রশাসক[১] মসজিদের মিম্বরে বসে জুমু'আর খোতবায় হযরত আলীর বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে বসে রওজা শরীফকে সামনে রেখে তাঁরই প্রিয়তম পাত্রকে গালমন্দ করা হতো। হযরত আলীর সন্তান ও নিকটজনকে নিজ কানে তা শুনতে হতো। শরীয়ত মাথায় থাকুন, নিছক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কারো মৃত্যুর পর তাকে গালমন্দ করা হৃদয়হীন অমানবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে জুমু'আর পবিত্র খোতবাকে এই ক্লেদাক্ততা দ্বারা অপবিত্র করা তো চরমতম ঘৃণ্য আচরণ। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয উমাইয়া পরিবারের অন্যান্য অপকর্মের মত এটিরও অবসান ঘটান এবং খোতবায় হযরত আলীর প্রতি গালাগালের পরিবর্তে এ আয়াত পড়ার নির্দেশ দেন।

ان الله يأمر بالعدل والاحسان الخ

মাওলানা মওদূদী তো বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই আল্লাহ্‌র রাছূলের ছাহাবীর বিরুদ্ধে তার কলমের 'কারিশমা' দেখিয়েছেন; আমাদের কলম কিন্তু কথাগুলো এখানে উদ্ধৃত করতে গিয়ে লজ্জায় অনুশোচনায় বার বার থমকে যাচ্ছিলো। তবু একান্ত অনন্যোপায় হয়েই আমাদেরকে তা করতে হয়েছে।

মাওলানা সাহেব তার বক্তব্যে তিনটি দাবী করেছেন। (ক) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজে তাঁর প্রিয় রাসূলের পিতৃব্যপুত্র এবং কলিজার টুকরা

১. تمام گورنر শব্দের তরজমা। আমাদের মতে, খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াতের বাংলা অনুবাদক এখানে 'সকল' শব্দটি বাদ দিয়ে অনুবাদের বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন করেছেন।

ফাতিমার স্বামী হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন। (খ) সকল আঞ্চলিক প্রশাসক এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিলেন এবং (গ) হযরত মু'আবিয়ার নির্দেশেই তারা এটা করতেন।

প্রথম অভিযোগ প্রমাণের জন্য তিনি তাবারী (খঃ ৪ পৃঃ ১৮৮) ইবনুল আছীর (খঃ ৩ পৃঃ ৮০) এ দু'টি উৎসগ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সবক'টি বরাতগ্রন্থ বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেও এমন কোন তথ্যের খোঁজ আমরা পাই নি, যাতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) স্বয়ং এ ঘৃণ্য বিদ'আতে জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু অভিযোগ যেহেতু সুনির্দিষ্ট; আর মাওলানা সাহেব 'অসত্য কহিয়াছেন' এমনটি কল্পনা করাও কষ্টকর, তাই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অন্যান্য উৎস-গ্রন্থও চষে ফেললাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন; মাওলানাকে অসত্য ভাষণের লজ্জা থেকে বাঁচানোর কোন উপায় আমাদের নাগালে আসে নি। এমনকি শিয়া ঐতিহাসিকদের বর্ণনাবলীতেও তাঁকে 'খুশী' করার মত কোন মশলা খুঁজে পাওয়া যায় নি। অথচ এ ধরনের কোন ঘটনা আদৌ ঘটে থাকলে শিয়া ঐতিহাসিকরা যে ছেড়ে কথা কইবে না সে তো বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে এমন অনেক বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিপথে এসেছে, যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, তুমুল রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি হযরত মু'আবিয়ার ছিলো সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। একইভাবে হযরত আলী (রাঃ)ও প্রতিপক্ষের দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা ও নিস্বার্থতার স্বীকৃতি দিতেন অকুণ্ঠ চিত্তে। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আদর্শের প্রশ্নে উভয়েই ছিলেন অটল, অবিচল।

জীবনের শেষ খোতবায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন—

لن يأتيكم من بعدى الا من انا خير منه كما ان من قبلى كان خيرا منى -

দেখো! আমার পূর্ববর্তীগণ যেমন আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, তেমনি আমার পরে কেউ আমার চেয়ে উত্তম হবে না। (ইবনুল আছিরকৃত আল কামিল খঃ ২ পৃঃ ৪)

হাফেজ ইবনে কাছীরের ভাষায়—

لما جاء خبر قتل على الى معاوية جعل يبكى فقالت له امراته : اتبكيه وقد قاتلته؟ فقال : ويحك انك لاتدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم -

'হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি কাঁদছেন, অথচ তাঁর সাথে তো আপনার লড়াই ছিলো! তিনি বললেন, পোড়ামুখী! তুমি জানো না; মহত্ত্ব, ফিকাহ ও ইলমের কী অমূল্য ধন মানুষ হারালো। (আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩০)

দেখুন; হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী লড়াই করার প্রসঙ্গ আনলেও এমন কথা বলেন নি যে, বেঁচে থাকতে তো তাঁর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইয়ে দিতেন, এখন যে কাঁদছেন বড়!

ইমাম আহমদ বলেন, হযরত বিছর বিন আরতাত (রাঃ) একবার হযরত মু'আবিয়া ও হযরত যায়দ বিন ওমর ইবনুল খাত্তাবের উপস্থিতিতে হযরত আলীকে মন্দ বললেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তখন তাঁকে তিরস্কার করে বললেন—

تشتم عليا وهو جده !

'আলীকে তুমি গালমন্দ করছো, অথচ তিনি এঁর দাদা হন।'

(তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২৪৮, প্রকাশঃ কায়রো)

হযরত মু'আবিয়ার মজলিসে একবার হযরত আলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু হলে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন—

رحم الله ابا الحسن ، كان والله كذلك -

আবুল হাসান (হযরত আলী)-কে আল্লাহ রহম করুন। সত্যি তিনি এমন ছিলেন। (ইসতী'আব খঃ ৩ পৃঃ ৪৩-৪৪, প্রকাশ কায়রো)

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ (রহঃ) আরো চমৎকার তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ফিকাহসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান চেয়ে হযরত মু'আবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে পত্র-যোগাযোগ করতেন। তাই তাঁর শাহাদাতের খবর পেয়ে শোকাহত হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন—

ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابى طالب -

আবু তালিব-পুত্রের মৃত্যুতে ইলম ও ফিকাহরও মৃত্যু হলো।

(ইসতী'আব, পৃঃ ৪৫)

মোটকথা, ইতিহাস ও হাদীছশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের অসংখ্য বর্ণনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাওলানা মওদূদী সাহেবের তীক্ষ্ণ নজর ফাঁকি দিয়ে

সেগুলো লুকিয়ে ছিলো, তা ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আল্লাহ মালুম; কোন্ হৃদয়ে, কোন্ সাহসে এক মজলুম ছাহাবীর বিরুদ্ধে এমন মারমুখী ও খড়গহস্ত হতে পারলেন তিনি!

মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় অভিযোগ—হযরত মু'আবিয়ার সকল আঞ্চলিক প্রশাসক মিম্বরে বসে হযরত আলীর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইয়ে দিতেন এবং হযরত মু'আবিয়ার নির্দেশেই এ অপকর্ম তারা করতেন।

'ঝড়' কি 'মৃদু কম্পন' সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের কথা হলো, এ ধরনের ঢালাও অভিযোগ উত্থাপনের আগে হযরত মু'আবিয়ার সকল আঞ্চলিক প্রসাসকের একটা পূর্ণ তালিকা তৈরী করে মাওলানাকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা পৃথক কিংবা সংঘবদ্ধভাবে এ অপরাধে লিপ্ত ছিলেন। এতটুকু প্রমাণ করতে পারলে মাওলানা হুজুরকে বাড়তি কোন কষ্ট না দিয়ে বিনা দলিলেই আমরা মেনে নেবো যে, হযরত মু'আবিয়ার নির্দেশেই এসব কিছু হতো।

কিন্তু আদৌ তা সম্ভব নয়। কেননা উল্লেখিত পাঁচটি বরাতগ্রন্থসহ ছোট বড় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ চষে বিস্তর সময়ের 'শ্রাদ্ধ' করে আমরা যা জানতে পেরেছি তা এই—

হযরত মু'আবিয়ার মাত্র দু'জন গভর্নর—হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম হযরত আলীর সমালোচনা করতেন। সেটাও ভয় পাওয়ার মত 'প্রচণ্ড ঝড়' ছিলো না কিছুতেই। সুতরাং আমীরুল মুমিনীনের নাম জড়িয়ে দু'জনের দোষ সকলের ঘাড়ে চাপানো হলো কোন্ হেকমতে সে কথা জানতে চাওয়া কি সখত বেআদবী হবে? আমাদের তো স্থির বিশ্বাস; সমস্ত জাল বর্ণনা একত্র করেও 'সকল আঞ্চলিক প্রশাসক' কথাটা ধোপে টেকানো সম্ভব নয়।[১]

এবার ঘটনা দু'টির সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করুন। প্রথম ঘটনাটি আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এবং পরবর্তীতে আল্লামা ইবনুল আছীর বর্ণনা করেছেন—

---

১. হযরত মুগীরাসম্পর্কিত তথ্যটি মাওলানা জোগাড় করেছেন তাবারী ও আল-কামিল থেকে, আর মারওয়ানকে টেনে এনেছেন আল-বিয়াদা (খঃ ৮ পৃ ২৫৯) থেকে। পক্ষান্তরে (খঃ ৯ পৃঃ ৮০)-তে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সাকাফীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন হযরত মু'আবিয়ার অনেক পরে খলীফা ওয়ালিদ বিন 'আবদুল মালিকের গভর্নর। অনুরূপভাবে ইবনুল আছীর (খঃ ৪ পৃঃ ১৫)-এ সাধারণভাবে উমাইয়া খলীফাদের কথা বলা হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া বা তাঁর প্রশাসকের নাম সেখানেও নেই।

قال هشام بن محمد عن ابى محنف عن المجالد بن سعيد والصقعب بن زهير وفضيل بن خديج والحسين بمن عقبة المرادى قال كل حدثنى بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث حجر بن عدى الكندى واصحابه ان معاوية ابن ابى سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة فى جمادى سنة ٤١ دعاه فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد : وقد اردت ايصاء ك باشياء كثيرة فانا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضينى ويسعه سلطانى ويصلح به رعيتى ولست تاركا ايصاء ك بخصلة لاتختم عن شتم على وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على اصحاب على والاقصاءلهم وترك الاستماع منهم ... ... قال ابو محنف قال الصقعب بن زهير سمعت الشعبى يقول ... واقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية سبع سنين واشهرا وهو من احسن شيئ سيرة واشده حبا للعافية غير انه لايدع ذم على والوقوع فيه -

'হিশাম বিন মুহাম্মদ আবু মুহান্নাফ থেকে এবং তিনি মুজালিদ বিন সাঈদ, ছাক'আব বিন জোহায়র, ফোজায়ল বিন খোদায়জ ও হোসায়ন বিন উকবা আল-মুরাদী থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবু মুহান্নাফ) বলেন, এ চার জনের প্রত্যেকে আমাকে আলোচ্য ঘটনার কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছেন। সুতরাং হাজার বিন আদী আলকিন্দীর যে ঘটনা আমি শোনাতে যাচ্ছি তা এ চারজনের বিচ্ছিন্ন বর্ণনার যুক্তরূপ।

৪১ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের কথা। মুগীরা বিন শো'বাকে কুফার প্রশাসক নিযুক্ত করার সময় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁকে ডেকে হামদ-ছানার পর বললেন—

দেখো; বিভিন্ন বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও এখন আমি সেদিকে যাচ্ছি না। কেননা আমি নিশ্চিতই জানি যে, আমার সন্তুষ্টি ও প্রজা-সাধারণের কল্যাণের প্রতি তোমার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ না দিয়ে পারি না; আলীর সমালোচনা এবং তাঁকে গালমন্দ

করা থেকে ক্ষান্ত হবে না। উসমানের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করার ব্যাপারে সংকোচ করবে না। আলী সমর্থকদের দোষচর্চা করে দূরে সরিয়ে রাখবে এবং তাদের কোন কথায় কান দেবে না।

ছাক'আব বিন যোহায়রের সূত্রে ইমাম শা'বীর বরাত দিয়ে আবু মুহান্নাফ বলেন, মু'আবিয়ার নিযুক্ত প্রশাসক হযরত মুগীরা কুফায় সাত বছর কয়েক মাস কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের লোক। সর্বব্যাপারে নিরুপদ্রবতাই ছিলো তাঁর অধিক পছন্দ। তবে আলীর সমালোচনা ও দোষচর্চা কখনো বাদ দিতেন না। (তাবারী, খঃ ৪ পৃঃ ১৭৮-৮৮)

তাবারীর এ বর্ণনাটাই হচ্ছে মাওলানা মওদূদীর একমাত্র 'কুড়ানো মাণিক,' যা হাতের নাগালে পেয়ে তিনি এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন এবং অগ্র-পশ্চাত না ভেবেই হযরত মু'আবিয়া ও তাঁর সকল প্রশাসকের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ এনে লিখে দিয়েছেন যে—

'তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে সকল প্রশাসক মিম্বরে বসে হযরত আলীর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইয়ে দিতেন.......'

আসুন এবার ঝড়ের মাত্রা পরিমাপ করা যাক। উপরওয়ালার পক্ষ থেকে এমন একটা লাগসই হুকুম পেয়ে হযরত মুগীরা বিন শো'বা হযরত আলীর কী ধরনের সমালোচনা করতেন, একই পৃষ্ঠায় একই রেওয়ায়েতে আবু মুহান্নাফের জবানীতেই তা শুনুন—

قام المغيرة فقال فى على وعثمان كما كان يقول وكانت مقالته اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزه باحسن عمله فانه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن دماء نا وقتل مظلوما ـ اللهم فارحم انصاره واولياء ه ومحبيه الطالبين بدمه ويدعو على قتلته ـ

হযরত মুগীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বরাবরের মত এবারও হযরত আলী ও হযরত উসমান সম্পর্কে বললেন, 'হে আল্লাহ! হযরত উসমান বিন আফফানকে রহম করুন, ক্ষমা করুন। তাঁর উত্তম কর্মের বিনিময় দান করুন। কেননা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক তিনি আমল করেছেন। এমনকি আমাদের রক্ত বাঁচাতে মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন। হে আল্লাহ! তার সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী, অনুরক্ত এবং কিসাসের দাবী উত্থাপনকারীদের প্রতি রহম করুন।' অতঃপর তিনি হযরত উসমান-হত্যাকারীদের নামে বদদু'আ করলেন।

(তাবারী, খঃ ৪ পৃঃ ১৮৮)

যথাযোগ্য বিনয়ের সাথে মাওলানার খিদমতে আমাদের প্রশ্ন; এখানে আপনি ঝড়ের আলামতটা কোথায় দেখতে পেলেন! আবু মুহান্নাফের বর্ণনা তো বরং এ কথাই প্রমাণ করে যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বকে কটাক্ষ করেও কিছু বলতেন না। হযরত উসমানহত্যাকারীদের অভিসম্পাত দিতেন মাত্র। আর সেটাই শিয়া বর্ণনাকারীদের বদান্যতায় হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পাত আখ্যা লাভ করেছে। বলাবাহুল্য যে, ইতিহাস যেহেতু হযরত মুগীরার শব্দগুলো হুবহু রেকর্ড করে রেখেছে সেহেতু সে আলোকেই আমাদেরকে ঘটনার বিচার করতে হবে। কোন বর্ণনাকারীর মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া কিংবা ভাববর্ণনা (INDIRECT NARRATION) এ ক্ষেত্রে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আসলে এমন একটা নির্জলা মিথ্যা বর্ণনা সম্পর্কে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কেননা সচেতন ও দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে জারীর ঘটনার শুরুতে যে সনদ যোগ করে দিয়েছেন সে সনদের আগাগোড়া সব ক'জন 'ভদ্রলোকই' হলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জাল বর্ণনার 'উসতাদ'। সনদের প্রথম কীর্তিমান পুরুষটি হলেন হিসাম বিন কালবী। তার সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আসাকিরের সতর্কবাণী হলো—

رافضى ليس بثقة ـ

এ লোক রাফেজী সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশ্বস্ত নয়। (লিসানুল মিযান, খঃ ৬ পৃঃ ১৬৯ প্রকাশক দাইরাতুল মা'আরিফ)

আল্লামা ইবনে হাজারের মতে ইবনে আবী তাঈ ও ইবনে আবী ইয়াকুব প্রমুখের মন্তব্যও অনুরূপ।

দ্বিতীয় বর্ণনাকারী আবু মুহান্নাফ লুত বিন ইয়াহয়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আদীর মন্তব্য—

شيعى محترق صاحب اخبارهم ـ

জলজ্যান্ত শিয়া; তাদের বর্ণনা নিয়েই তার কায় কারবার।

(লিসানুল মিযান, খঃ ৬ পৃঃ ১৯৭)

তৃতীয় বর্ণনাকারী মুজালিদ বিন সাঈদের দুর্বলতা সম্পর্কে হাদীছশাস্ত্রের সকল ইমাম একমত। এমনকি ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি যয়ীফ ও দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ইয়াহয়া বিন সাঈদ তাঁর জনৈক বন্ধুকে জীবনচরিতসংক্রান্ত কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুজালিদ বিন সাঈদের কাছে যেতে দেখে বলেছিলেন, যাও; এক বস্তা মিথ্যে লিখে নিয়ে এসো।[১]

তাছাড়া ইমাম আশাজ এর মতে তিনি ছিলেন কট্টর শিয়া।[২]

চতুর্থ বর্ণনাকারী ফোজায়ল বিন খোদায়জ সম্পর্কে আল্লামা হাফেয যাহাবী ও আল্লামা ইবনে হাজার 'বর্জনীয়' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন।[৩]

অবশিষ্ট দু'জন বর্ণনাকারী একেবারেই অখ্যাত, জাতগোত্রপরিচয়হীন ব্যক্তি।[৪]

বলুন দেখি; এমন চিহ্নিত সাধু পুরুষদের কাঁধে সওয়ার হয়ে ছাহাবাচরিত্রে কলংক লেপন করা কি ভালো মানুষের কর্ম?

মাওলানা মওদূদী অবশ্য কৈফিয়ত পেশ করে লিখেছেন—

'আল্লামা ইবনুল আরাবী ও ইবনে তায়মিয়ার রচনাবলীর উপর ভরসা না করে আমি স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ বেছে নিয়েছি। কেননা এ দুই 'ভদ্রমহোদয়' মূলতঃ শিয়াদের জবাবে তাঁদের 'কেতাব' লিখেছেন। ফলে তাদের অবস্থান সাফাই সাক্ষীর পর্যায়ে নেমে এসেছে।' (খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত)

বেশ ভালো কথা! কিন্তু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার পর্যালোচনার দাবী কি এই যে, নির্ভরযোগ্য সাফাই সাক্ষীর যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যও আপনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন; অথচ মিথ্যাচারী শিয়া বাদীর সব কথাই চোখ বুজে মেনে নেবেন? আল্লামা ইবনুল আরাবী ও ইবনে তায়মিয়া হযরত মু'আবিয়ার বন্ধু হলেও হযরত আলীর শত্রু তো নন। পক্ষান্তরে হিশাম কালবী ও আবু মুহান্নাফরা হলো মু'আবিয়াবিদ্বেষী চক্রের নটবর। 'মু'আবিয়াপ্রীতি' না হয় অপরাধ হলো, কিন্তু মু'আবিয়াবিদ্বেষ কি খুব প্রশংসার?

মাওলানা মওদূদীর আরেক যুক্তি—

---

১. লিসানুল মিযান, খঃ ৪ পৃঃ ৪৯২

২. কিতাবুল জারহে ওয়া তাতদীল খঃ ৩ পৃঃ ৩৬১, তাহযীবুত্তাহযীব খঃ ১০ পৃঃ ৪০

৩. মিযানুল ইতদাল খঃ ২ পৃঃ ৩৩৪, লিসানুল মিযান খঃ ৪ পৃঃ ৪৫৩

৪. আল জারহ ওয়া তাদীল খঃ ২ পৃঃ ৪৫৫

'অনেক মহোদয় ইতিহাসের বর্ণনা বাছাই করতে গিয়েও রিজাল-শাস্ত্রের[৪] কেতাব খুলে বসে যান এবং আওড়াতে শুরু করেন যে, অমুক অমুক বর্ণনাকারীকে রিজালশাস্ত্রের ইমামগণ দোষদুষ্ট বলে রায় দিয়েছেন। (সুতরাং তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।) আসলে মহোদয়রা বেমালুম ভুলে যান যে, মুহাদ্দিছগণ আহকাম ও বিধানবিষয়ক হাদীছ বাছাইয়ের জন্যই শুধু এ বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।'

অতঃপর মওলানার সিদ্ধান্ত—

'সুতরাং দোষদুষ্ট বর্ণনাকারীদের যে সব রিওয়ায়েত ইবনে সা'আদ, আব্দুল বার, ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর ও ইবনে হাজার প্রমুখ নির্ভরযোগ্য ওলামা নিজ নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন সেগুলোকে রদ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই।' (পৃঃ ২১৭-১৯)

তবে আমাদের ছোট্ট একটি প্রশ্ন; ইতিহাসসংক্রান্ত বর্ণনার সনদগত চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই যদি থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকল বর্ণনার শুরুতে সনদ যোগ করার খাটুনিটা কেন খাটলেন? এ ফালতু কাজটুকু না করলেই কি হতো না? নাকি সনদ উল্লেখ করে প্রকারান্তরে বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণের সবটুকু দায় দায়িত্ব তাঁরা পাঠক-গবেষকদের উপর ন্যস্ত করেছেন?

আসলেও তাই। ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব ছিলো সনদ বা সূত্রসহ অনুকূল-প্রতিকূল, আসল-ভেজাল নির্বিশেষে সকল বর্ণনা গ্রন্থবদ্ধ করা। সে দায়িত্ব যথেষ্ট দক্ষতার সাথেই তারা আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। পরবর্তী যুগের বিদগ্ধ গবেষকদের দায়িত্ব হলো চোখ-কান খোলা রেখে বিচার বিশ্লেষণের স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে সেগুলো বাছাই করে দেখা এবং উত্তীর্ণ বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ইতিহাসের বেলায় রিজালশাস্ত্রের 'কেতাব' খুলে বসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার আগে মাওলানার ভেবে দেখা উচিত, আল্লামা ইবনে জারীরের তাবারীতে এমন কথাও রয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) সেনাপতির সুন্দরী স্ত্রীর চোখ ধাঁধানো রূপ-যৌবনে লালায়িত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সুকৌশলে তাকে হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিহাসের বেলায় রিজালশাস্ত্রের কেতাবগুলো 'পিনআপ' করে দিলে এমন চটকদার ঐতিহাসিক বর্ণনার কী জবাব

---

৪. হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্তবিষয়ক শাস্ত্র।

দেয়া যাবে? পরস্পরবিরোধী বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াই বা কীভাবে কাজ করবে?[১]

হযরত মুগীরা বিন শো'বাসম্পর্কিত বিশেষ রেওয়ায়েতটাই যেহেতু এখন আমাদের আলোচ্যবিষয় সেহেতু বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের মাঝে মৌলিক তফাত কী? সে প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে আমরা করবো না। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, নিম্নলিখিত কারণে আলোচ্য বর্ণনাটি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদীও আমাদের বক্তব্যের সাথে একমত হতে মর্জি করবেন।

প্রথমতঃ আলোচ্য সনদের সকল বর্ণনাকারী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আর মু'আবিয়াবিদ্বেষী শিয়াদের কোন বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মহান ব্যক্তিত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করা যেতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সনদের কোন কোন বর্ণনাকারী অখ্যাত কিংবা দুর্বল। আর ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এ ধরনের বর্ণনা কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য হলেও তা কোন ছাহাবীর চরিত্রহননের অস্ত্র হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যুক্তি ও প্রজ্ঞার বিচারেও আলোচ্য বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কুফার মিম্বরে হযরত মুগীরা (রাঃ) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র নির্দেশে সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে 'গালাগালের ঝড়' সৃষ্টি করে থাকলে সে ঝড়ের বর্ণনাকারীর সংখ্যা হতো অনেক। একজন মাত্র বর্ণচোরা শিয়া, মিথ্যাচারী না হয়ে হতো শ'য়ে শ'য়ে। হযরত মু'আবিয়ার এ জঘন্য বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারে এমন নির্ভীক মুমিনের সত্যি কি কাহাত পড়েছিলো ইসলামী উম্মাহর প্রথম কল্যাণশতাব্দীতে? হাজার বিন আদি ছাড়া আর কোন মরদে মুজাহিদ কি ছিলো না কুফার মসজিদে?

ছাহাবাসুলভ পবিত্রতা ও মহত্ত্বের কথা না হয় বাদ দেয়া গেলো, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কথা তো

১. মজার ব্যাপার এই যে, আবু মুহান্নাফ, কালবী ও হিশামের মত মহাদুষ্ট লোকদের জীবন-বৃত্তান্ত জানার জন্য প্রতিপক্ষকে রিজালশাস্ত্রের কেতাব খুলে বসার অনুমতি না দিলেও ঠেকায় পড়ে মাওলানা সাহেব নিজে কিন্তু সে কর্মটি করেছেন। খেলাফত ওয়া মুলূকিয়াত গ্রন্থের পৃঃ ৩০৯ থেকে ৩২০ পর্যন্ত একের পর এক রিজালশাস্ত্রের বিভিন্ন ইমামের মন্তব্য আউড়ে গেছেন বেশ অকুণ্ঠ চিত্তে। তাহলে দুয়ারটা শুধু আমাদের জন্য বন্ধ রাখার মাজেযাটা কী?

শত্রুরাও স্বীকার করে, মাওলানা মওদূদীও আশা করি অস্বীকার করেন না। তাহলে বিবেক-বুদ্ধিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আমরা কি এমন কথাও মেনে নেব যে, তাঁর মত প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিশারদ নিছক আক্রোশের বশে বছরের পর বছর এমন আত্মঘাতী কাজে মেতে ছিলেন? আলী (রাঃ)-র ভক্তদের প্রাণকেন্দ্র কুফার মসজিদে তাঁর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইতে দিয়ে মু'আবিয়া (রাঃ) কি এটাই চাচ্ছিলেন যে, এখনও কুফাবাসীদের সাথে তাঁর সংঘাত-সংঘর্ষ ও তিক্ততা জিইয়ে থাকুক এবং হিংসা-বিদ্বেষের আগুন তাদের অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকুক। এমন কাণ্ড তো সেই হনুমান রাজাকেই শুধু সাজে যিনি প্রজা-সাধারণকে আপন সিংহাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে মাথার দিব্বি করে বসেছেন।

মোটকথা, উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই আলোচ্য বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি মাওলানা মওদূদী আল-বিদায়া থেকে নিয়েছেন, যার মূল ইবরাত এরূপ—

ولما كان (مروان) متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر، وقال له الحسن بن على : لقد لعن الله اباك الحكم وانت فى صلبه على لسان نبيه فقال لعن الله الحكم وما ولد – (والله اعلم)

মারওয়ান মদীনা মুনাওয়ারায় প্রশাসক থাকাকালে প্রতি জুমু'আয় মিম্বরে বসে হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করতেন। হযরত হাসান বিন আলী একদিন দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে তোমার বাবা হাকামকে ঐ সময় অভিসম্পাত করেছেন যখন তুমি তার পৃষ্ঠদেশে লুকিয়ে ছিলে। তিনি বলেছেন, 'হাকাম ও তার ঔরসজাতদের উপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করুন।'

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ২৫৯)

আমাদের মতে হাদীছটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। প্রথমতঃ আল বিদায়ার মূল মিশরীয় নোসখায় গোটা ব্যাপারটাই অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ রিওয়ায়েতের শেষাংশে যে লা'নতের কথা বলা হয়েছে তা নবুয়তের পরিচিত ভাষা নয়।

অবশ্য অন্যান্য বর্ণনা থেকেও মোটামুটি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম এমন কিছু 'অশোভন' শব্দ ব্যবহার করতেন যা হযরত আলীর অনুসারীদের মর্মপীড়ার কারণ হতো। কিন্তু কোন ইতিহাসগ্রন্থেই সে শব্দগুলোর স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে—

ان رجلا جاء الى سهل بن سعد فقال : هذا فلان لامير المدينة يدعو عليا عند المنبر قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له ابو تراب، فضحك وقال : والله ماسماه الا النبى صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم احب اليه منه ـ

'এক লোক হযরত সোহায়ল (রাঃ)-র কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, মদীনার আমীর মিম্বরে বসে হযরত আলীকে গালমন্দ করেন। হযরত সোহায়ল জিজ্ঞাসা করলেন, তা কী বলেন তিনি? সে বললো, তিনি তাকে 'আবু তোরাব' বলেন। হযরত সোহায়েল তখন হেসে বললেন, আল্লাহর কসম! এ নামে তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর কাছে এর চেয়ে প্রিয় কোন নাম তাঁর ছিল না।'[১]

মদীনার আমীর বলে এখানে মারওয়ানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং তা থেকে গালমন্দের ধরনও পরিষ্কার হয়ে গেলো। আবু তোরাব শব্দের আভিধানিক অর্থ ধূলিমলিন, রূপক অর্থ লাঞ্ছিত। সম্ভবতঃ রূপক অর্থেই মারওয়ান শব্দ দু'টি ব্যবহার করতেন।

ধরুন: মারওয়ান হয়তো আরো অশালীন ভাষাই প্রয়োগ করতেন। কিন্তু এটা কি করে বোঝা গেলো যে, এ সবের পেছনে হযরত মু'আবিয়ার নির্দেশ বা মৌন সম্মতি ছিলো? আমরা সত্যি বুঝে উঠতে পারি না; এ সমস্ত সুরতেহাল সামনে রেখে কিসের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদী এ সিদ্ধান্ত টানতে পারলেন যে, হযরত মু'আবিয়া নিজে এবং তাঁর নির্দেশে 'সকল' প্রশাসক মিম্বরে খোতবায় দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইতে দিতেন!

উপরের দীর্ঘ আলোচনায় দিবালোকের মত এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে—

১. মু'আবিয়া (রাঃ) নিজে হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করতেন-এর বিন্দুমাত্র প্রমাণ ইতিহাসের কোন কিতাবে নেই। পক্ষান্তরে এমন হাজারো দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে যে, তিনি ভরা মজলিসে উচ্ছ্বসিত ভাষায়

১. বুখারী খঃ ১ পৃঃ ৫২৫, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে আলী

হযরত আলী (রাঃ)-র প্রশংসা করতেন। এমনকি অন্য কেউ সামান্যতম কটূক্তি করলেও তাকে তিনি কঠোর তিরস্কার করতেন।

২. 'সকল প্রশাসক' কথাটা একবারেই শিকড়হীন। মাওলানার দেয়া বরাত-গ্রন্থগুলোতে মাত্র দু'জন প্রশাসকের নাম পাওয়া যায়।

৩. দুই প্রশাসকের একজন অর্থাৎ মারওয়ান ইবনুল হাকামের ঘটনায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র নির্দেশ বা মৌন সম্মতির কোন প্রমাণ নেই।

৪. 'গালাগালের ঝড়' কথাটাও মাওলানা হুজুরের নিজস্ব আবিষ্কার। কেননা তাঁর দেয়া বরাত-গ্রন্থগুলোতে সুনির্দিষ্ট কোন শব্দের উল্লেখ নেই। বুখারী শরীফের ابو تراب শব্দটিকে টেনেটুনে গালমন্দ বলা গেলেও ভয় পাওয়ার মত ঝড় সেটা নয়।

৫. হযরত মুগীরাসম্পর্কিত বর্ণনায় দেখা যায়, আসলে তিনি উসমান-হত্যাকারীদের নামে বদ দু'আ করতেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন না।

তদুপরি সনদ ও যুক্তি উভয় বিচারেই বর্ণনাটি অবশ্য বর্জনীয়। কিন্তু যা কিছু বর্জনীয় তাই যদি হয় কারো পছন্দনীয় তাহলে আমরা তার জন্য 'দু'আ-খায়ের' ছাড়া আর কী করতে পারি।'

পঞ্চম অভিযোগ

যিয়াদকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান

মাওলানা মওদূদীর ভাষায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ধর্মহীন রাজনীতির তথাকথিত যে পলিসি প্রবর্তন করেছিলেন তার পঞ্চম প্রমাণ হলো 'পিতৃপরিচয়হীন' যিয়াদ বিন সুমাইয়াকে ভ্রাতৃমর্যাদা দান। মাওলানা মওদূদী লিখেছেন—

'যিয়াদ বিন সুমাইয়াকে ভ্রাতৃমর্যাদা দানের মাধ্যমে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামী শরীয়তের একটি সর্বস্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। জনশ্রুতি এই যে, হযরত মু'আবিয়ার পিতা 'জনাব' আবু সুফয়ান জাহেলিয়াতের যুগে তায়েফের এক ক্রীতদাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। আবু সুফয়ানের সেই অবৈধ যৌনাচারেরই ফসল হলো যিয়াদ। তিনি নিজেও একবার আভাস দিয়েছিলেন যে, যিয়াদ তার ঔরসজাত সন্তান।

পরিণত বয়সে যিয়াদ উচ্চস্তরের প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতাসহ বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হয়ে উঠলো। হযরত আলীর খেলাফতকালে সে তাঁর মজবুত সমর্থক ছিলো এবং তাঁর পক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলো। এই পিতৃপরিচয়হীন লোকটিকে দলে ভিড়ানোর মতলবে হযরত মু'আবিয়া 'সম্মানিত' পিতার ব্যভিচারের পক্ষে সাক্ষী সংগ্রহে নামেন এবং প্রমাণ করে ছাড়েন যে, যিয়াদ আবু সুফয়ানের 'হারামযাদা'![1] তারপর সেই সুবাদে তাকে তিনি ভ্রাতৃমর্যাদায় আপন পরিবারভুক্ত বলে ঘোষণা করেন।

নৈতিকতার কথা বাদ দিয়ে নিছক আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেও হযরত মু'আবিয়ার এ পদক্ষেপ ছিলো সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের মাধ্যমে নসব বা ঔরস প্রমাণিত হয় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'শয্যা যার সন্তান তার, আর যিনাকারীর প্রাপ্য হলো প্রস্তরাঘাত।'

---

১. এতদিন আমাদের ধারণা ছিলো যে, এজাতীয় শব্দ কোন 'সম্ভ্রান্ত' মানুষের মুখে বা কলমে আসতে পারে না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) এ জন্যই শেষ পর্যন্ত তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলেছেন।' (পৃঃ ১৭৫)

যে দুঃখজনক ভাষায় আলোচ্য ঘটনাটি মাওলানা মওদূদী বিবৃত করেছেন সে সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করবো না, শুধু হৃদয় থেকে বেদনার রক্ত এবং চোখ থেকে অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়ে প্রার্থনা করবো, যেন আল্লাহ্ তার 'অবুঝ বান্দার' কলমের কলংক মুছে দেন।

এখানে আমরা মাওলানা মওদূদীর দেয়া বরাতগ্রন্থের মূল উদ্ধৃতি পেশ করছি।

মোট চারটি উৎসগ্রন্থের বরাত তিনি দিয়েছেন। আল-ইসতীআব খঃ ১ পৃঃ ১৯৬, ইবনুল আছীর খঃ ৩ পৃঃ ২২০-২১, আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ২৮ ও ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ৭ ও ৮।

আল বিদায়ায় মাত্র সাত লাইনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘটনার ইতি টানা হয়েছে। ফলে সেখান থেকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। মাত্র ইবনে খালদুনই তুলনামূলক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—

كانت سمية ام زياد مولاة للحارث بن كلدة الطبيب و ولدت عنده ابا بكرة ثم زوجها بمولى وولدت زيادا وكان ابو سفيان قد ذهب الى الطائف لبعض حاجته فاصابها بنوع من انكحة الجاهلية - وولدت زيادا هذا ونسبته الى ابى سفيان واقرلها به الا انه كان يخفيه -

'যিয়াদের মা সুমাইয়া ছিলো হারিছ বিন কালদহর ক্রীতদাসী। তার ঔরসে সুমাইয়ার গর্ভে হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সে তাকে নিজের আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেয়। সে সময় সুমাইয়ার গর্ভে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করে। (ঘটনা এই যে) কোন কার্যোপলক্ষে আবু সুফয়ান একবার তায়েফ গেলেন। সেখানে জাহেলিয়াতের প্রচলিত কোন এক বিবাহ পদ্ধতিতে সুমাইয়ার সাথে তিনি মিলিত হলেন। পরে যিয়াদের জন্ম হলে সুমাইয়া তাকে আবু সুফয়ানের ঔরসজাত বলে ঘোষণা করে এবং আবু সুফয়ান গোপনীয়তা রক্ষা করে তা স্বীকার করে নেন। (খঃ ৩ পৃঃ ১৪, প্রকাশ দারুল কুতুব, বৈরুত)

এরপর ইবনে খালদুন আরো লিখেছেন—

لما قتل على وصالح زياد معاوية وضع مصقلة بن هبيرة الشيبانى على معاوية ليعرض له بنسب ابى سفيان ففعل ، ورأى معاوية ان يستميله باستلحاقه فالتمس الشهادة بذلك ممن علم لحوق نسبه بابى سفيان فشهد له رجال من اهل البصرة والحقه ، وكان اكثر شيعة على ينكرون ذلك وينقمون على معاوية حتى اخوه ابوبكرة -

হযরত আলীর শাহাদাতের পর যিয়াদ হযরত মু'আবিয়ার সাথে সমঝোতায় উপনীত হন। যিয়াদের নির্দেশে মুছকালা বিন হোবায়রা তখন হযরত মু'আবিয়াকে যিয়াদের ঘটনা আদ্যোপান্ত অবহিত করেন। (সব ঘটনা শুনে) যিয়াদকে তিনি নসবের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অনুগত করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং এ সম্পর্কে অবগত লোকদের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বছরার কিছু লোক যিয়াদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে। হযরত আলীর অধিকাংশ সমর্থক মু'আবিয়ার এ পদক্ষেপের সমালোচনা করতেন। এমনকি তার (যিয়াদের) ভাই হযরত আবু বকরাও। (খঃ ৩ পৃঃ ১৫)

মাওলানা মওদূদীর দেয়া আরেকটি বরাতগ্রন্থ হলো ইবনুল আছীরকৃত আল কামিল। ইবনুল আছীর শুরুতে শুধু এতটুকু লিখেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে হযরত আবু সুফয়ান সুমাইয়ার সাথে সহবাস করেছিলেন। তারপর এ সম্পর্কে বেশ চটকদার কিছু গল্প শুনিয়ে লিখেছেন—

وجرى اقاصيص يطول بذكرها الكتاب فاضربنا عنها ومن اعتذر بمعاوية قال انما استلحق معاوية زيادا لان انكحة الجاهلية كانت انواعا لاحاجة الى ذكرجميعها وكان منها ان الجماعة يجامعون البغى فاذا حملت وولدت - الحقت الولد بمن شاءت منهم فيلحقه فلما جاء الاسلام حرم هذا النكاح الا انه اقر كل ولد كان ينسب الى اب من اى نكاح كان من انكحتهم على نسبه ولم يفرق بين شيء منها -

'এছাড়া আরো অনেক গল্পই বাজার পেয়েছে। গ্রন্থের কলেবরের কথা ভেবে তা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। হযরত মু'আবিয়াকে যারা নির্দোষ মনে করেন তাদের

বক্তব্য হলো, জাহেলিয়াতের যুগে কয়েক পদ্ধতিতে বিবাহ-প্রথা চালু ছিলো। যেমন, এক নারীর সাথে একাধিক পুরুষ মিলিত হতো। প্রসবের পর মা সন্তানকে যার ঔরসজাত বলে ঘোষণা করতো সে তার সন্তান বলে স্বীকৃতি লাভ করতো। ইসলামপরবর্তী যুগে এ ধরনের বিবাহ-প্রথা হারাম হলেও জাহেলী যুগে প্রচলিত বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সকল নসবই ইসলাম বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নসবের ব্যাপারে উভয় যুগের বিবাহে কোন পার্থক্য করে নি।

(আল-কামিল খঃ ৩ পৃঃ১৭৬)

আল্লামা ইবনে খালদুন ও ইবনুল আছীরের বিবরণ থেকে এটা অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, হযরত আবু সুফয়ান (রাঃ) তায়েফে সুমাইয়ার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন নি, বরং জাহেলী যুগের সমাজস্বীকৃত এক বিশেষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ইসলাম সে ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও সে বিবাহের কোন নিষ্পাপ ফসলকে পিতৃপরিচয়হীন বা জারজ সন্তান বলার অধিকার কাউকে দেয় নি।

অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে আল্লামা ইবনুল আছীর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে—

'হযরত মু'আবিয়ার ধারণায় এ ধরনের ঔরসভুক্তি বৈধ ছিলো। আসলে তিনি জাহেলী যুগে ঘোষিত ঔরসভুক্তি এবং ইসলামপরবর্তী যুগে ঘোষিত ঔরসভুক্তির মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। তাঁর এ পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা ঘৃণিত হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী উম্মাহ একমত। (মু'আবিয়ার) আগে কেউ এ ধরনের ঔরসভুক্তি করেন নি, যা নযীররূপে পেশ করা যেতে পারে।'

কিন্তু ঘটনার আগাগোড়া বিশ্লেষণ থেকে আল্লামা ইবনুল আছীরের আপত্তি অমূলক প্রমাণিত হয়। হযরত আবু সুফয়ান যদি জাহেলী যুগে সম্পূর্ণ নীরব থেকে ইসলামপরবর্তী যুগে পিতৃত্বের দাবী করতেন তাহলেই কেবল এ ধরনের আপত্তি হালে পানি পেতো এবং ঔরসভুক্তির বেলায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) জাহেলী যুগের ঘোষণা ও ইসলামী যুগের ঘোষণার মাঝে পার্থক্য করেন নি বলে সমালোচনার একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু ইতিহাস বলে; গোপনীয়তা রক্ষা করে জাহেলী যুগেই হযরত আবু সুফয়ান পিতৃত্বের দাবী করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে খালদুনের ভাষায়—

و ولد زياد ونسبته الى ابى سفيان واقرلها به الا انه كان يخفيه -

যিয়াদ জন্ম নিলো এবং সুমাইয়া তাকে আবু সুফয়ানের সাথে সম্পৃক্ত করলো। আবু সুফয়ানও তা স্বীকার করে নিলেন, তবে তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন।

যিয়াদের জন্ম যেহেতু আবু সুফয়ানের ইসলাম গ্রহণের আগেই হয়েছিলো, সেহেতু নিশ্চিতরূপেই ধরে নেয়া যায় যে, জনসাধারণ্যে প্রকাশ না পেলেও যিয়াদের ঔরসভুক্তি তখনই সম্পন্ন হয়েছিলো। একাধিক ছাহাবাসহ দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সম্পর্কে তাঁদের সাক্ষ্যও পেশ করেছিলেন। আর তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই হযরত মু'আবিয়া (রহঃ) যিয়াদের ঔরসভুক্তি অনুমোদন করেছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন—

'৪৪ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) যিয়াদের ঔরসভুক্তি অনুমোদন করেন। আর যিয়াদের পক্ষে দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। (তারপর সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করে ইবনে হাজার বলেন) মুনযির বিন যোবায়ের তাঁর সাক্ষ্যে বলেন—

আমি নিজে হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি; আবুসুফয়ান এ ধরনের কথা বলেছিলেন।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনার পর এক খোতবায় হযরত মু'আবিয়া যিয়াদের ঔরসভুক্তি অনুমোদন করলেন। যিয়াদ তখন (নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে) বললেন, "এরা যা বলছে তা সত্য হলে আলহামদু লিল্লাহ! আর মিথ্যা হলে আমার ও আল্লাহর মাঝে এদেরকে আমি যিম্মাদার বানালাম।'

(আল-ইছাবাহ খঃ ১ পৃঃ ১৬৩, প্রকাশ কায়রো)

ঐতিহাসিক আবু হানিফা দীনাওয়ারীর মতে দশম সাক্ষী ইয়াযিদের সাক্ষ্যের ভাষা ছিলো এরূপ—

'আবু সুফয়ানকে আমি বলতে শুনেছি যে, যিয়াদ সেই বীর্যবিন্দুর ফসল যা আমি তার মা সুমাইয়ার গর্ভে প্রক্ষেপণ করেছিলাম।

এতে প্রমাণিত হয় যে আবু সুফয়ান যিয়াদের সন্তানত্ব দাবী করেছিলেন।

(আল-আখবার তিওয়াল পৃঃ ২১৯, কায়রো, আব্দুল মুনয়ীম আমের সম্পাদিত)

ঐতিহাসিক মাদায়েনীর বরাত দিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার যে ক'জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের অন্যতম হলেন হযরত মালিক বিন রাবীয়া

বিন সালুলী (রাঃ)। তিনি ছিলেন বাই'আতে রিযওয়ানে শরীক আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ছাহাবাদের অন্যতম। (আল-ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৩২৪)

উপরোক্ত পরিস্থিতি সামনে রেখে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এক জুমু'আয় খোতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং সুযোগ-সন্ধানী শত্রুদের নিন্দা-সমালোচনা ও কুৎসা রটনার তোয়াক্কা না করে ছাহাবাসুলভ তেজোদীপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন—

اما والله لقد علمت العرب انى كنت اعزها فى الجاهلية وان الاسلام لم يزدنى الا عزا وانى لم اتكثر بزياد من قلة ولم اتعزز به من ذلة ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه ـ

'আল্লাহর কসম! গোটা আরব জানে, জাহেলী যুগেও আমি আরবের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলাম। ইসলাম আমার সে মর্যাদা আরো মহিমান্বিত করেছে। সুতরাং জনবল ও সামাজিক মর্যাদা আমার এতটা কম নয় যে, যিয়াদকে দলে ভিড়িয়ে তা পুষিয়ে নিতে হবে। আসল ঘটনা এই যে আমি তার অধিকার বুঝতে পেরেছি, সুতরাং সে অধিকার তাকে আমার দিতেই হবে।'[১]

ইতিহাসের পাতায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এ তেজোদ্দীপ্ত শপথ ঘোষণা দেখার পরও কোন্ হৃদয়ে মাওলানা মওদূদী লিখতে পারলেন যে, যিয়াদ বিন সুমাইয়ার ঔরসভুক্তি অনুমোদনের বেলায়ও হযরত মু'আবিয়া রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের এক স্বীকৃত বিধান লঙ্ঘন করেছেন। মুহূর্তের জন্যও কেন তার হৃদয় কেঁপে উঠলো না! কলম কেন থমকে গেলো না!'

আশ্চর্য! তেরশ বছর বাদের এক পণ্ডিত গবেষক কলমের এক খোঁচায় যিয়াদ বিন আবু সুফয়ানকে 'হারামযাদা' বানিযে ছাড়লেন, অথচ হযরত মু'আবিয়ার সমসাময়িক সমালোচনাকারীদের একজনও সে কথা বলেন নি। তাদের সবার বক্তব্য বরং এই ছিলো যে, দাসী সুমাইয়ার সাথে হযরত আবু সুফয়ানের সহবাসই হয় নি।

হযরত আবু বকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতার কথা বেশ উৎসাহের সাথে প্রচার করা হয়, অথচ আল্লাহর কোন বান্দা দয়া করে ভেবে দেখলো না যে, তিনি নিজেই তাঁর বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন—

১. ইবনুল আছীর খঃ ৩ পৃঃ ১৭৬, তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৬৩, ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ১৬

لا ... والله ماعلمت سمية رأت ابا سفيان قط -

না, আল্লাহর কসম! আমি জানি না, সুমাইয়া আবু সুফয়ানকে চোখের দেখাও কখনো দেখছে কি না। (আল ইসতী'আব তাহতাল ইছাবাহ খঃ ১ পৃঃ ৫৫০)

আব্দুর রহমান ৰিন হাকাম তো হযরত মু'আবিয়ার কুৎসা গেয়ে সুদীর্ঘ এক কবিতা পর্যন্ত ফেঁদে বসেছিলেন। কিন্তু তার আপত্তিও ছিলো ঐটুকুই।[১]

অন্যদিকে নিন্দাকাব্যের বিরল প্রতিভা বিন মুফাররাগও যিয়াদকে কটাক্ষ করে এর বেশী কিছু বলতে সাহস পায় নি—

شهدت بان امك لم تباشر + ابا سفيان واضعة القناع

(আবু সুফয়ান তোমার বাবা হলো কি করে?) আমি তো বেশ জানি; তোমার মা কখনো ঘোমটা খুলে আবু সুফয়ানের তলে শোয় নি।

(আল ইসতী'আব খঃ ১ পৃঃ ৫৫২)

বোধগম্য উদ্দেশ্যে ইবনে আমিরও যিয়াদের ঔরসভুক্তি অবৈধ প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। কিন্তু তিনিও তেরশ বছর পরের গবেষক মাওলানার মত অতদূর এগুতে সাহস পান নি। তিনি শুধু বলতেন, হায়! কোরাইশের এমন একদল লোক যদি পেয়ে যেতাম যারা কসম খেয়ে বলতে পারে যে, আবু সুফয়ান সুমাইয়াকে চোখেও দেখে নি। (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৬৩)

প্রশ্ন হলো; সমালোচনাকারীরা অতটা ঘুরপথে না গিয়ে সোজাসুজি এ কথাটা কেন বললো না যে, সুমাইয়ার সাথে আবু সুফয়ানের সহবাস হয়ে থাকলেও সেটা স্রেফ অবৈধ যৌনাচার ছিলো। তা না করে সবাই কিনা আদাজল খেয়ে এ কথাই শুধু প্রমাণ করতে চাচ্ছিলো যে, সুমাইয়া আবু সুফয়ানকে কখনো চোখের দেখাও দেখে নি! এতে কি প্রমাণ হয় না যে, জাহেলী যুগে সুমাইয়ার সাথে আবু সুফয়ানের সহবাস প্রমাণিত হলে যিয়াদের ঔরসভুক্তিতে তাদেরও কোন আপত্তি ছিলো না। প্রমাণের অভাবেই শুধু তারা তা মেনে নিতে পারছিলেন না! সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য যে, দশজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর মোকাবিলায় তাদের এ অজ্ঞতা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে অচল মুদ্রার মতই অচল।

এখানে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র কোন দোষ দুর্বলতা চোখে পড়া তো দূরের কথা; ঘটনার আগাগোড়া বিশ্লেষণের পর আমাদের হৃদয়-মন বরং

১. আল ইসতী'আব তাহতাল ইসাবাহ খঃ ১ পৃঃ ৫৫১।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান ছাহাবীর প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আরো অভিভূত হয়ে পড়ে। সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক আভিজাত্যের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে শরীয়তের আহকাম ও বিধানের সামনে নিজেকে সর্বোতভাবে সঁপে দেয়ার এমন অনুপম দৃষ্টান্ত ইসলামী উম্মাহর স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসে দু'একটিই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। ভেবে দেখুন; গতকাল পর্যন্ত সারা দুনিয়া এক বাক্যে যাকে জারজ সন্তান বলে জানতো; জানতো অন্ধকারের কীট বলে; তাকে, সমাজের সেই অস্পৃশ্য মানুষটিকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরা একজন সাধারণ লোকের আত্মমর্যাদার পক্ষেও কী প্রচণ্ড আঘাত হতে পারে! অথচ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্রের এক অভিজাত পরিবারের অভিজাত সন্তান। আমীরুল মুমিনীন হিসাবে তিনি তখন গোটা ইসলামী জাহানের যেমন অখণ্ড শ্রদ্ধার পাত্র; তেমনি শত্রুশিবিরেও ভীতি ও সমীহের পাত্র। কিন্তু যে মুহূর্তে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের দাবী নিয়ে দুরু দুরু বুকে যিয়াদ এসে দাঁড়ালো, সে মুহূর্তেই আরবীয় অহংবোধ, পারিবারিক আভিজাত্য এবং সুযোগ-সন্ধানীদের নিন্দা-কুৎসার আশংকা দু'পায়ে দলে আল্লাহর বান্দা এগিয়ে এলেন অকুতোভয়ে। বলে উঠলেন নির্ভীক কণ্ঠে—

عرفت حق الله فوضعته موضعه -

আল্লাহর হক আমি অনুধাবন করতে পেরেছি, তাই যথাস্থানে তা পৌঁছে দিয়েছি। (ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ১৬)

এটা না করে তিনি যদি মিথ্যা আভিজাত্যের মোহে কিংবা কুৎসা-নিন্দার ভয়ে একটি মানুষের পিতৃপরিচয় লুকিয়ে রাখতেন তাহলে মানুষের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কাল আখেরাতে আল্লাহ ও রাসুলের সামনে কী কৈফিয়ত দিতেন তিনি?

এজন্যই দেখি; পরবর্তীকালে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সমালোচকদের অনেকেই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র খিদমতে হাজির হয়ে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন, আর ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১]

সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমাদের মা হযরত আয়েশা (রাঃ)ও যিয়াদকে বরাবর এভাবে পত্র লিখতেন—

১. আল ইসতী'আব খঃ ১ পৃঃ ৫৫১-৫৫, তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৬৩

من عائشة ام المؤمنين الى ابنها زياد

মুমিনদের মা আয়েশার পক্ষ হতে আপন পুত্র যিয়াদের নামে।[১]

কিন্তু পরে সব বিষয় অবগত হয়ে তিনিও তাঁর মত প্রত্যাহার করেছিলেন এবং কোন এক উপলক্ষে যিয়াদকে এভাবে সম্বোধন করে পত্র লিখেছিলেন—

من عائشة ام المؤمنين الى زياد بن ابى سفيان

মুমিনদের মা আয়েশার পক্ষ হতে যিয়াদ বিন আবু সুফয়ানের নামে।

ঐতিহাহিসক ইবনে আসাকিরের মতে যিয়াদ সে পত্র পেয়ে এতই উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, বারবার তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করতেন এবং যাকে পেতেন তাকেই চিঠি পড়ে শোনাতেন। (তাহযীবে ইবনে আসাকির খঃ ৫ পৃঃ ৪১১)

আশা করি; মাওলানা মাওদূদী সাহেবকে এবার আমরা মনে ধরার মতো একটি তথ্য দিতে পেরেছি। সুতরাং তাঁর বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আমাদের প্রত্যাশা; ঘটনার সামগ্রিক সুরতেহাল অবগত হয়ে তিনিও মুমিনসুলভ সাহসিকতার সাথে নিজের ভুল স্বীকার করে নেবেন এবং জমজমের পানিতে কলমটা ধুয়ে নিয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে নতুন যাত্রা শুরু করবেন।

১. ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ১৭-১৮

ষষ্ঠ অভিযোগ

প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচার

হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আরোপিত আরেকটি গুরুতর অভিযোগ এই—

"আঞ্চলিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে শরীয়তের বিধান মুতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী সরাসরি নাকচ করে দিয়ে হযরত মু'আবিয়া তাদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে বলে ঘোষণা করলেন।" (পৃঃ ১৭৫)

মাওলানা সাহেব তাঁর এ 'আবিষ্কারের' সমর্থনে মোট ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ঘটনা

বসরার প্রশাসক আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন গীলান মসজিদের মিম্বরে বসে খোতবা দিচ্ছিলো। খোতবা চলাকালে এক ব্যক্তি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে ইবনে গীলান তাকে ধরে এনে সোজা তার হাত কেটে দিলো। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা হস্তকর্তনের মত কোন অপরাধ ছিলো না। পরে হযরত মু'আবিয়ার কাছে ফরিয়াদ পেশ করা হলে তিনি বললেন, দেখো; হাতের দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) অবশ্য বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার কর্মচারীদের থেকে কিসাস নেয়ার কোন উপায় নেই।" (পৃঃ ১৭৫-১৭৬)

বরাবরের মত এবারও মাওলানা সাহেব ঘটনার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অংশটা চেপে গেছেন। বরং বলা ভালো; ধড় থেকে মুণ্ডটি তিনি ছেঁটে ফেলেছেন। প্রদত্ত বরাতগ্রন্থ ইবনে কাছীরে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পড়ুন—

ثم دخلت سنة خمس وخمسين فيها عزل معاوية عبد الله بن غيلان عن البصرة و ولى عليها عبيد الله بن زياد وكان سبب عزل معاوية ابن غيلان عن

البصرة انه كان يخطب الناس فحصبه رجل من بنى ضبة فامر بقطع يده فجاء قومه اليه فقالوا له : انه متى بلغ امير المؤمنين انك قطعت يده فى هذا الصنيع فعل به وبقومه نظير ما فعل بحجربن عدى فاكتب لنا كتابا انك قطعت يده فى شبهة فكتب لهم فتركوه عندهم حينا ثم جاؤوا معاوية فقالوا له : ان نائبك قطع يد صاحبنا فى شبهة فاقدنا منه ـ قال : لا سبيل الى القود من عمالى ولكن الدية، فاعطاهم الدية وعزل ابن غيلان ـ

এ বছরেই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে গীলানকে বরখাস্ত করে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন।

বরখাস্তের কারণ; একবার তিনি খোতবা দেয়ার সময় বনু যাব্বা গোত্রের এক লোক তাকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। আর সেই অপরাধে তিনি তার হাত কেটে দিলেন। গোত্রের লোকেরা তখন ইবনে গীলানকে বুঝিয়ে বললো, আমাদের ভয় হয় যে, আমীরুল মুমিনীন এর হাত কাটা যাওয়ার কারণ জানতে পারলে আমাদের সাথে হাজার বিন আদীর অনুরূপ আচরণই করবেন। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের এইটুকু লিখে দিন যে, সন্দেহবশতঃ আপনি এর হাত কেটেছেন। ইবনে গীলান তাই লিখে দিলেন। লেখাটা কিছুদিন তারা নিজেদের কাছেই রেখে দিলো। পরে সুযোগ বুঝে হযরত মু'আবিয়ার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ জানালো যে, বসরার প্রশাসক নিছক সন্দেহের বশে আমাদের এক ব্যক্তির হাত কেটে দিয়েছে। আমরা এর কিসাস (হাতের বদলা হাত) দাবী করছি। হযরত মু'আবিয়া বললেন, আমার প্রশাসকদের থেকে কিসাস নেয়ার কোন উপায় নেই। তবে তোমরা দিয়ত নিতে পারো। (তারা রাজি হলে) তিনি তাদের দিয়তের ব্যবস্থা করলেন। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ বিন গীলানকে (দায়িত্বহীনতার শাস্তিস্বরূপ) বরখাস্ত করলেন। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৭১)

শব্দের সামান্য হেরফের ছাড়া আল্লামা ইবনুল আছীরের বক্তব্যও অভিন্ন।

কিসাস ও দিয়তের শরীয়তী বিধান সম্পর্কে বকলম হলেই শুধু কারো পক্ষে এমন একটি ইনসাফপূর্ণ ফায়সালার সমালোচনা করা সম্ভব। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে; মাওলানা মওদূদীর মত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হলো কি করে? ইবনে কাছীরে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, লিখিত স্বীকারোক্তিসহ ইবনে গীলানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মুকাদ্দমার মুসাবিদা হলো; অভিযুক্ত ইবনে গীলান নিছক সন্দেবশতঃ এক ব্যক্তির হাত কেটে দিয়েছে।

'সন্দেহবশতঃ হস্তকর্তন' ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের এক বিশেষ পরিভাষা। শরীয়তের বিধান মতে চুরির অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিলে হাত কাটার শাস্তি মওকুফ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত সন্দেহের সুবিধাটুকু (Benefit of Douot) অভিযুক্ত ব্যক্তি ভোগ করে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে শাসক যদি ভুলক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেন তাহলে ফিকাহশাস্ত্রের বিধান মতে উদ্ভূত সন্দেহের অপর সুবিধাভোগী হওয়ার সুবাদে কোনক্রমেই কিসাসরূপে শাসকের হাত কাটা যাবে না। অন্যথায় কোন ব্যক্তি এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পদ গ্রহণে রাজি হবে না। কেননা মাটির মানুষ হিসাবে শাসকও ভুলের শিকার হতে পারেন। ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের কিসাসসংক্রান্ত এ বিধানের প্রতি ইংগিত করেই বাদী পক্ষকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছেন—

'আমার প্রশাসকদের থেকে কিসাস নেয়ার কোন উপায় নেই।'

তবে এ কথা সত্য যে, হাত কাটা যাওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তাই আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বাইতুল মাল থেকে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সাথে দায়িত্ব পালনে চরম অযোগ্যতা প্রদর্শনকারী আব্দুল্লাহ বিন গীলানকে প্রশাসকের পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন। আর বরখাস্তের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, 'আপন অধীনস্থদের তিনি আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতেন' (?)

সত্যি; কপালে হাত দিয়ে হায় আল্লাহ! বলা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর ও ইবনুল আছীর (মাওলানা মওদূদী এ দু'জনের বরাত পেশ করেছেন) যেখানে ঘটনার 'শুরু ও শেষ' করেছেন প্রশাসক ইবনে গীলানের বরখাস্তপ্রসঙ্গ দিয়ে; সেখানে তিনি তা বেমালুম চেপে গিয়ে কলমের এক খোঁচায় লিখে দিলেন যে, হযরত মু'আবিয়া তার অধীনস্থদের আইন ও শরীয়তের ঊর্ধ্বে মনে করতেন। ঘোর 'কলিকাল' বলেই না কলমের এমন 'কারিশমা' আজ আমাদের হজম করতে হলো!

তবে যথাযোগ্য বিনয়ের সাথে মাওলানার খিদমতে আমাদের আরজ, আপনার আদালতে আজ যেমন আল্লাহর রাসূলের ছাহাবাদের বিচার চলছে, তেমনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর আদালতে একদিন আমাদের সকলের বিচার বসবে এবং সেদিনটি হবে বড়ই কঠিন, যদি না আল্লাহ্ রহম করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

তাবারী ও ইবনুল আছীরের বরাত দিয়ে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন—

'যিয়াদ একবার একসাথে বহুলোকের হাত শুধু এই অপরাধে কেটে ফেললো যে, খোতবা দেয়ার সময় তারা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো।'

ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এবার অবশ্য মাওলানা সাহেব বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তর্কের খাতিরে আলোচ্য বর্ণনাটি নির্ভুল ধরে নিলেও আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য এই যে, এটা যিয়াদের ব্যক্তিগত আচরণ। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে এ জন্য কোনক্রমেই দোষারোপ করা চলে না। কেননা কোন ইতিহাস গ্রন্থেই এ কথা নেই যে, যিয়াদের অপরাধ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র গোচরীভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নি। হতে পারে ঘটনাটা আমীরুল মুমিনীন আদৌ জানতে পারেন নি। এমনও হতে পারে যে, ইবনে গীলানের মত এ ঘটনাও তাঁর কাছে বিকৃত করে পেশ করা হয়েছিলো এবং যিয়াদকে তিনি যথোপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছিলেন। অবশ্য ইতিহাস সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু ইতিহাসের নীরবতাকে মূলধন করে কীভাবে এমন 'সফেদ' কথা বলা যেতে পারে যে, 'দরবারে খিলাফত থেকে এরও কোন প্রতিকার করা হয় নি?'

তৃতীয় ঘটনা

ঘটনাটি হচ্ছে হযরত বিসর বিন আরতাতকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের বর্ণনা মতে ইয়ামেনে হযরত আলী (রাঃ)-র নিযুক্ত প্রশাসক ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাসের দু'টি শিশুপুত্রকে তিনি হত্যা করেছিলেন। শুধু কি তাই! হামাদানের কতিপয় মুসলিম নারীকে তিনি নাকি দাসী পর্যন্ত বানিয়ে ছেড়েছিলেন!

শিশুহত্যার গল্পটি সত্য হলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের ঘটনা নয়, অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ের ঘটনা। উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। আর তখনকার ঘটনাবলী বর্ণচোরাদের কালো হাতের কারসাজিতে এমন পত্রপল্লবিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে যে, মূল সত্যের নাগাল পাওয়া প্রায় তেরশ বছর বাদের কোন গবেষকের কর্ম নয়। মজার ব্যাপার এই যে, একই বর্ণনার শেষাংশে আল্লামা তাবারী লিখেছেন—

'হযরত বিসর বিন আরতাতের মোকাবেলার জন্য হযরত আলী হযরত জারিয়া বিন কোদামাকে দু'হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। আর তিনি নাজরান অঞ্চলে চড়াও হয়ে গোটা বস্তিতেই আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং উসমান-শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। পরে মদিনায় এসে হযরত আবু

হোরায়রার উপর মসজিদে চড়াও হলেন, আর আবু হোরায়রা নামাজ ছেড়ে কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। শিকার হাতছাড়া হতে দেখে জারিয়া বিন কোদামা তখন ঠোঁট কামড়ে বললেন—

والله لو اخذت ابا سنور لضربت عنقه -

আল্লাহর কসম! বেড়াল মুন্সির[১] নাগাল পেলে গর্দানটাই আজ উড়িয়ে দিতাম। (তাবারী খঃ ৪ পৃ ১০৭)

আরেকবার হযরত আলী (রাঃ) তাকে বসরায় পাঠালেন। সেখানে হযরত মু'আবিয়ার নিযুক্ত প্রশাসক আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজরামীকে তিনি ঘরে আটকে রেখে জিন্দা জ্বালিয়ে দিলেন। (ইসতী'আব তাহতাল ইছাবাহ খঃ ১ পৃঃ ২৪৭)

এ ধরনের ভিত্তিহীন ঐতিহাসিক গুজবের পাখায় ভর করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছাহাবী হযরত আলী কিংবা হযরত মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার দুঃসাহস আমাদের অন্তত নেই। উভয় পক্ষকেই এ ধরনের পাশবিকতা থেকে আমরা চিরপবিত্র বলে বিশ্বাস করি। কোন পক্ষের কোন প্রশাসক সত্যি সত্যি এ ধরনের বাড়াবাড়ি করে থাকলে হযরত আলী কিংবা হযরত মু'আবিয়া কেউ এজন্য দায়ী নন। কেননা উভয়েই নিজ নিজ অধীনস্থদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিতেন। মদীনাবাসীদের লক্ষ্য করে হযরত বিসর বিন আরতাতের এ ঘোষণা বহু ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

'হে মদীনাবাসী! মু'আবিয়ার নিষেধ না থাকলে এ শহরে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আজ প্রাণে বাঁচত না।' (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১০৬, ইসতী'আব খঃ ১ পৃঃ ১৬৬, ইবনে আসাকির।)

অর্থাৎ শিশুহত্যা অনুমোদন করা তো দূরের কথা; নির্বিচারে বয়স্কহত্যার ব্যাপারেও তাঁর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিলো। তদুপরি ইতিহাস বলে; ফিতনা পরবর্তী যুগে হযরত বিসর বিন আরতাতের কিছু কিছু বাড়াবাড়ি কথা জানতে পেরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাকে পদচ্যুত করেছিলেন।

(ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ৯৯৮)

---

১. আবু হোরায়রা-অর্থ বেড়াল পালক। কথিত আছে যে, পথের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া বেড়াল তিনি সযত্নে বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। তাই তার এ উপনাম বা কুনিয়াত। 'সিননাওর' শব্দের অর্থও বেড়াল। নবী আলাইহিস সালামের দেয়া আবু হোরায়রা কুনিয়াতকে কটাক্ষ করে সিননাওর বলা হয়েছে।

এবার মুসলিম নারীদের দাসী বানানোর প্রসঙ্গে আসা যাক। আল-ইসতী'আব ছাড়া আর কোন ইতিহাসগ্রন্থেই এ গল্প ঠাঁই পায় নি। হাফেজ ইবনে আসাকির দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী হযরত বিসর বিন আরতাতসম্পর্কিত যাবতীয় সবল-দুর্বল বর্ণনা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। হামদান আক্রমণের ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানেও এ ধরনের আজগুবি গল্পের হদিস নেই। আল-ইসতী'আব গ্রন্থেই শুধু খুব দুর্বল এক সনদে তা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের একজন মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ভাষায়—

لاتحل الرواية عندى عن موسى بن عبيدة -

আমার মতে মূসা বিন ওবায়দাহ থেকে বর্ণনা করা 'হালাল' নয়।

(আল-জারহ ওয়া তা'দীল আবু হাতিম আল-রাজীকৃত খঃ ৪ পৃঃ ১৫২)

যুক্তি ও প্রজ্ঞার বিচারেও রিওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ধরনের ঘটনা আদৌ যদি ঘটতো, মুসলিম নারীরা সত্যি যদি হাটে বাজারে দাসীরূপে বিক্রি হতো, তাহলে ইসলামী ইতিহাসের এক নজীরবিহীন ট্রাজেডি হিসাবে মানুষের মুখে মুখে তা অবশ্যই ছড়িয়ে পড়তো। শত শত বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করতো। অথচ এমন মর্মবিদারক ঘটনার বর্ণনাকারী কিনা মাত্র একজন ব্যক্তি। তদুপরি ব্যক্তিটি এমনই সাধু পুরুষ যে, আল-ইসতী'আব ছাড়া আর কোন ইতিহাসগ্রন্থে তার আশ্রয় জুটে নি।

এদিকে এ সমস্ত জাল বর্ণনার ভিত্তিতে মাওলানা সাহেব যাকে 'জালিম' আখ্যায়িত করেছেন, সেই বিসর বিন আরতাত (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-র মন্তব্য শুনুন—

'হযরত জোহায়র বিন আরকাম বলেন, 'এক জুমু'আয় খোতবা দিতে গিয়ে হযরত আলী আমাদের (তিরস্কার করে) বললেন, বিসর বিন আরতাতের ইয়ামেন দখলের খবর পেলাম।............ আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, ওদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কেননা ইমামের প্রতি ওরা অনুগত আর তোমরা অবাধ্য, ওরা বিশ্বস্ত আর তোমরা তা নও, ওরা সংশোধন প্রয়াসী, অথচ নিজ ভূমিতেই তোমরা নৈরাজ্যপ্রিয়।' (আল বিদায়া, খঃ ৭ পৃঃ ৩২৫)

আল্লামা হাফেয ইবনে হাব্বানের মতে—

وله اخبار شهيرة فى الفتن لاينبغى التشاغل بها -

ফিতনার যুগে তার (বিসর বিন আরতাত) সম্পর্কে অনেক গল্পই মশহুর হয়েছে। সে সব নিয়ে মাথা ঘামানো সমীচীন নয়। (আল ইছাবাহ খঃ ১ পৃঃ ১৫২)

কিন্তু মাথা ঘামানোতেই যাদের আনন্দ, ইবনে হাব্বানের এত নরম নছীহত কি তাদের মাথাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারে!

চতুর্থ ঘটনা

অধীনস্থদের বাড়াবাড়ির চতুর্থ ঘটনাটি মাওলানা মওদূদীর ভাষায়—

'প্রতিশোধের উন্মত্ততায় পরাজিত শত্রুর মস্তক কর্তন এবং নিহত ব্যক্তির লাশের সাথে পৈশাচিক আচরণের যে বর্বর প্রথা জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিলো, ইসলাম তার মূলোৎপাটন করেছিলো। কিন্তু এ আমলে মুসলমানদের মধ্যে সে প্রথা পুনরায় চালু হয়ে গেলো।

মুসনাদ গ্রন্থে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং তাবাকাত গ্রন্থে হযরত ইবনে সাআদ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন, সিফ্ফিন যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন য়াসিরের মাথা কেটে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র কাছে হাজির করা হয়েছিলো। আর দু'ব্যক্তি তাঁর সামনেই আম্মার-হত্যার কৃতিত্ব নিয়ে জোর তর্ক-লড়াই শুরু করেছিলো। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিলো প্রথম মুণ্ডকর্তন।'

আমাদের মতে সিফ্ফীন যুদ্ধের অরাজকতাকালীন এ ঘটনা আদৌ সত্য হলে সে জন্য হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) অপরাধী নন। কেননা আলোচ্য বর্ণনা হযরত আম্মারের মুণ্ডকর্তনের কথাই শুধু আমাদের জানিয়েছে। কিন্তু এ মর্মান্তিক ঘটনা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো? অপরাধীদের সাথেই বা তিনি কী আচরণ করেছিলেন? সর্বোপরি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে কী পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন? সে সকল প্রসঙ্গ বর্ণনাকারীরা সযত্নে পাশ কেটে গেছেন। ইবনে গীলানের বরখাস্তপ্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ঘটনার বিকৃত রূপদানের নজীর কলিকালের মত সেকালেও ছিলো বৈকি। তাদের আবার বাড়তি সুবিধেও ছিল। কারন ইতিহাস গ্রন্থগুলো তখন রচিত হচ্ছিলো মাত্র।

ঠিক এ ধরনের গল্প খোদ ইবনে সা'আদ হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। তাবাকাতের বর্ণনা মতে, জনৈক ওমায়র বিন জারমুয হযরত যোবায়র বিন আওয়ামের কর্তিত মুণ্ড হযরত আলীকে উপহার দিয়েছিলো। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ খঃ ৩ পৃঃ ১২২, যোবায়র বিন আওয়ামপ্রসঙ্গ)

আমরা কিন্তু যুদ্ধ ও নৈরাজ্যকালীন এসব ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য উভয়ের কাউকে দায়ী মনে করি না। কেননা এসবের পিছনে তাঁদের নির্দেশ বা সম্মতি ছিলো না, বরং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ ধরনের পৈশাচিক কাণ্ডকর্মের তাঁরা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং সম্ভব হলে শাস্তিবিধানও করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, যুদ্ধের উম্মাদনায় ঘটনাপ্রবাহ অনেক সময় তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতো। সেজন্য হযরত আলী ও মু'আবিয়া বিভিন্ন সময় যে অসহায় আক্ষেপ ও মর্মজ্বালা প্রকাশ করেছেন তার নমুনা ইতিহাসগ্রন্থেই আছে।

(আল-বিদায়া খঃ ৭ পৃ ৩২০)

জানি, দুষ্ট লোকের মনে প্রশ্ন হবে, আলী (রাঃ) সম্পর্কে তো বর্ণিত আছে যে, যোবায়র-হত্যাকারীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তো এধরনের কোন কথা ইতিহাসে নেই? এ ক্ষেত্রে বন্ধুদের আমরা তর্কশাস্ত্রের একটা সাধারণ সবকই শুধু স্মরণ করিয়ে দেব যে, 'অনুল্লেখ' 'অনস্তিত্বে'র প্রমাণ নয়।

ইতিহাসের নীরবতার পিছনে অনেক রহস্যই লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেটাকে পুঁজি বানিয়ে ছাহাবাদের চরিত্রহননের 'তেজারত' যারা করে তাদের আমরা ভালো মানুষ বলি কী করে!

মাওলানা মওদূদীর ভাষায়—

'দ্বিতীয় মুণ্ডটি হলো ছাহাবী হযরত আমর ইবনুল হামাকের। দুর্ভাগ্যক্রমে উসমান-হত্যাকাণ্ডের সাথে তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন। এক গুহায় আত্মগোপনকালে সর্পদংশনে তাঁর মৃত্যু হয়। যিয়াদ তাঁর কর্তিত মুণ্ড দামেস্কে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র দরবারে পাঠিয়ে দেয়। সে মাথা দামেস্কের রাজপথে প্রদর্শনের পর তার শোকবিহ্বল বিধবা স্ত্রীর কোলে নিক্ষেপ করা হয়।'

এ ঘটনার স্বপক্ষে মাওলানা সাহেব তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ইসতী'আব, আল-বিদায়া ও তাহজীবুত্তাহজীব—চারটি উৎসগ্রন্থের বরাত টেনেছেন। কিন্তু ঘটনার আপত্তিকর অংশ অর্থাৎ দামেস্কের রাজপথে মুণ্ড প্রদর্শনের কথা আল-বিদায়া গ্রন্থেই শুধু সনদবিহীন অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। ইসতী'আব, তাহজীব ও তাবাকাতের কোথাও এ ধরনের মুখরোচক কাহিনীর অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই নি। পক্ষান্তরে তাবারীর এক বর্ণনা থেকে প্রমাণ মিলে যে, ফিতানা ও নৈরাজ্যের নাযুক মুহূর্তেও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ন্যায় বিচার ত্যাগ করেন নি। এমন কি আমর বিন হামাকের বেলায়ও তাঁর ফায়সালা ছিলো

সম্পূর্ণ শরীয়তানুগ। শিয়া বর্ণনাকারী আবু মুহান্নাফের সূত্রে আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী লিখেছেন—

আমর বিন হামাকের গ্রেফতারীর পর মোসেলের প্রশাসককে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) লিখে পাঠালেন—

انه طعن عثمان بن عفان تسع طعنات بمشاقص كانت معه وانا لانريد ان نعتدى عليه فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان -

হযরত উসমানের দেহে তিনি নয়টি খঞ্জরাঘাত করেছেন। আমরা তার উপর বাড়াবাড়ি করতে চাই না। তুমিও তার দেহে নয়টি খঞ্জরাঘাত করবে।

(তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯৭)

মজার ব্যাপার এই যে, আবু মুহান্নাফের মত কট্টর শিয়া বর্ণনাকারী মুণ্ডকর্তন ও প্রদর্শনের অলীক কাহিনীর পরিবর্তে এমন এক বিচার নির্দেশের উল্লেখ করেছেন, যা সর্বোতভাবেই শরীয়তসম্মত ও ন্যায়ানুগ। মুণ্ড প্রদর্শনীর মত এমন লাগসই ঘটনার খোঁজ পেয়েও তা এড়িয়ে যাওয়ার মত ভালো মানুষ অন্তত আবু মুহান্নাফ তো নন। শিয়াদের মু'আবিয়াবিদ্বেষ তো আর লুকানো ছুপানো বিষয় নয়।

মোটকথা: আল-বিদায়ার বর্ণনা একদিকে যেমন সনদবিহীন অন্যদিকে তেমনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র প্রবাদতুল্য সহনশীলতার সাথেও সামঞ্জস্যহীন। এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদী কেন যে তাবারীর পরিচ্ছন্ন বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে আল-বিদায়ার পিতৃপরিচয়হীন বর্ণনাটার প্রতি দুর্বলতা দেখালেন তা সত্যি এক রহস্য। শিয়া আবু মাহান্নাফের প্রতি মাওলানা সাহেবের একটা দুর্বলতা সবসময় আমরা লক্ষ্য করে এসেছি, কিন্তু এখানে এসে সেই আবু মুহান্নাফকেও তিনি অবজ্ঞা করলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বড় সুন্দর লিখেছেন—

'দু' ধরনের বর্ণনাই যখন সনদসহ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তখন সেই বর্ণনাগুলো কেন আমরা গ্রহণ করবো না, যা তাঁর গোটা জিন্দেগীর কর্মধারার সাথে সংগতিপূর্ণ? কেনই বা খামোখা ঐ সব বর্ণনা আঁকড়ে ধরবো, যা তাঁর জীবন ও চরিত্রের সাথে আগাগোড়া সংঘর্ষপূর্ণ?' (পৃঃ ৩৪৮)

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বেলায় এসে এ সুন্দর নীতিটি মাওলানা মওদূদী কেন হাতছাড়া করলেন? একতরফা কতগুলো বর্ণনার ভিত্তিতে কেন তিনি এই আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন যে—

'এ সমস্ত কর্মকাণ্ড কার্যত এ কথাই ঘোষণা করছিলো যে, প্রশাসক ও সেনাপতিদের জুলুম ও স্বেচ্ছাচার শরীয়তের কোন বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ নয়।' (পৃঃ ১৭৭)

মাওলানার উপস্থাপিত ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর স্বরূপ আমরা আপনার সামনে তুলে ধরলাম। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন অসংখ্য ঘটনা আপনার চোখে পড়বে, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, জীবনের কোন দুর্বলতম মুহূর্তেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ন্যায় ও ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। অধীনস্থ প্রশাসকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বাড়াবাড়ির প্রতিও কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। অবশ্য এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোন কোন বাড়াবাড়ির খবর তাঁর কাছে আদৌ পৌঁছে নি। কলেবর সংকোচনের স্বার্থে এখানে আমরা একটি ঘটনাই শুধু উল্লেখ করবো।

আল্লামা ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন—

'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থক জনৈক সাআদ বিন সারাহ প্রশাসক যিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ইমাম হাসানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলো। সব বিষয় অবগত হয়ে হযরত হাসান যিয়াদ-এর নামে চিঠি লিখলেন। কিন্তু যিয়াদের পক্ষ থেকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব এলো। সে চিঠি পড়ে হযরত হাসান মৃদু হাসলেন।[১] তারপর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আদ্যোপান্ত লিখে জানালেন। সেই সাথে যিয়াদের চিঠির নকলও পাঠিয়ে দিলেন।'

এ চিঠির প্রতিক্রিয়া আল্লামা ইবনে আসাকিরের ভাষায় শুনুন—

فلما وصل كتاب الحسن الى معاوية وقرأ معاوية الكتاب ضاقت به الشام

হযরত হাসানের চিঠি পড়ে (চিন্তা ও ক্ষোভের কারণে) সিরিয়ার যমীন যেন তাঁর জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো। যিয়াদকে কড়া নির্দেশ দিয়ে তিনি লিখলেন—

---

১. কেননা তিনি জানতেন, অধীনস্থদের এহেন আচরণে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র কী প্রতিক্রিয়া হবে।

'হাসানের নামে লেখা তোমার চিঠি আমি দেখেছি। যে অপবাদ তাকে তুমি দিয়েছো সেগুলো বরং তোমার নামেই খাটে ভালো। আমার চিঠি পাওয়ামাত্র সাআদ বিন সারাহ-এর পরিবার পরিজনকে বাজেয়াফতকৃত মালামালসহ মুক্ত করে দাও এবং ধ্বসিয়ে দেয়া বাড়ীটা পুনর্নির্মাণ করে দাও। কোনভাবেই এরপর তাকে আর উত্যক্ত করো না। হাসানকেও আমি এ মর্মে অবগতিপত্র লিখে দিয়েছি।' (ইবনে আসাকির খঃ ৫ পৃঃ ৪১৮-১৯)

এরপর কি আমাদের আর কিছু বলার আছে? কিংবা মাওলানা মওদূদীর কি কিছু বলার ছিলো? তবু তিনি বলেছেন এবং আমাদের বলতে বাধ্য করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তাঁকে এবং আমাদেরকে।

সপ্তম অভিযোগ

হাজার বিন আদীর মৃত্যুদণ্ড

মজলুম ছাহাবী হযরত মু'আবিয়াকে লক্ষ্য করে "আইনের শাসন বিলোপ" নামে ছয় ছয়টি তীর ছোঁড়ার পর মওদূদী সাহেব তাঁর তূণীরের শেষ তীরটি ছুঁড়েছেন 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিলোপ' নামে। তাঁর ভাষায়—

'রাজতন্ত্র মানুষের মুখে তালা ঝুলিয়ে দিলো এবং বিবেকের টুটি চেপে ধরলো। অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, 'প্রশংসার জন্যই শুধু মুখ খোলবে, নইলে স্রেফ চুপমেরে থাকবে। তোমার বেয়াড়া বিবেক সত্য ভাষণের জন্য একান্তই যদি উতলা হয়ে ওঠে, তাহলে কারানির্যাতন ও হত্যা-নিপীড়নের জন্য তোমাকে অবশ্যই তৈরী হতে হবে।

শাসকের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে হক কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, কিংবা রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্মমতম উপায়ে নির্মূল করা হয়েছে, যেন গোটা জাতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ নতুন পলিসির সূত্রপাত হয় হযরত মু'আবিয়ার আমলে হযরত হাজার বিন আদীকে হত্যা করার মাধ্যমে। তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার ছাহাবী। ছিলেন উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় সৎ লোকদের অন্যতম। মিম্বরে মিম্বরে হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে গালাগাল ও অভিসম্পাত বর্ষণের কারণে সর্বত্র সাধারণ মুসলিম-হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলো। কুফায় হযরত হাজার বিন আদীর পক্ষে ধৈর্য ধরা আর সম্ভব হলো না। হযরত আলীর প্রশংসা এবং মু'আবিয়ার সমালোচনায় তিনি গর্জে উঠলেন। হযরত মুগীরা তাঁর সঙ্গে নমনীয় আচরণ করলেও পরবর্তী প্রশাসক যিয়াদের সাথে তাঁর বাদানুবাদ চরম আকার ধারণ করলো। একদিকে যিয়াদ খোতবায় হযরত আলীকে গালমন্দ করতো, অন্যদিকে হাজার বিন আদী তার প্রতিবাদ করতেন। জুমু'আর নামাজ বিলম্বিত করার কারণেও একবার তিনি তাকে তিরস্কার করলেন। শেষে যিয়াদ বারজন অনুগামীসহ তাকে গ্রেফতার করলো এবং এই মর্মে একদল সাক্ষী জোগাড় করলো যে, এ লোক রীতিমত একটি গ্যাং তৈরী করে ফেলেছে। আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে এই বলে এরা

বিদ্রোহের উস্কানি দেয় যে, আবু তালিবের পরিবারই খিলাফতের একমাত্র বৈধ অধিকারী। গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীনের প্রশাসকদের এরা নাজেহাল করেছে। এরা আবু তোরাবের (হযরত আলী রাঃ) উগ্র সমর্থক, তাই তাঁর জন্য রহমত প্রার্থনা করে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলে বেড়ায়।

সাক্ষী-তালিকায় কাজী শোরায়হের নামও ঢুকানো হলো। কিন্তু আলাদা এক পত্রে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে তিনি লিখে জানালেন—

'আমি জানতে পেরেছি যে, হাজার বিন আদীর বিরুদ্ধে সাক্ষীদাতাদের মধ্যে আমার নামও রয়েছে। হাজার সম্পর্কে আমার আসল সাক্ষ্য এই যে, ছালাত, যাকাত ও হজ্জ-ওমরাহ পালনে তিনি একনিষ্ঠ এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। এবার ইচ্ছে হয় তাঁকে কতল করুন, ইচ্ছে হয় মাফ করুন।'

কড়া পাহারায় আসামী দলটি দামেস্কে পৌঁছামাত্র মু'আবিয়া তাদের কতলের হুকুম দিলেন। হাজার বিন আদীর কাঁধে তলোয়ার রেখে জাল্লাদ বললো, দেখো; আলীকে অভিসম্পাত করতে রাজী হলে তোমাকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু হাজার বিন আদী ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'যে কথায় আমার আল্লাহ নারাজ হবেন তা আমি কী করে বলবো?'

যাই হোক সাতজন অনুগামীসহ তিনি শহীদ হলেন। অষ্টম অভিযুক্ত আব্দুর রহমান বিন হাসানকে যিয়াদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে মু'আবিয়া নির্দেশ দিলেন, 'নির্মমতম উপায়ে একে খুন করো।'

যিয়াদ তাকে যিন্দা মাটিতে গেড়ে ফেললো।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় উম্মাহর সৎ ও চিন্তাশীলদের হৃদয় কেঁপে উঠলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ মজলুম ছাহাবীর জীবন রক্ষার জন্য মু'আবিয়ার নামে আগেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরে এক সাক্ষাতে তিনি তাঁকে কঠোর তিরস্কার করে বললেন, মু'আবিয়া! হাজারকে খুন করতে তোমার মনে কি আল্লাহর বিন্দুমাত্র ভয় জাগে নি?'

খোরাসান অঞ্চলের প্রশাসক রাবী বিন যিয়াদ আল-হারেছী ঊর্ধ্ব পানে দু'হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! এখনো যদি আমার মাঝে কোন কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে দুনিয়া থেকে আমাকে দয়া করে তুলে নাও।' (পৃঃ ১৬৩-৬৫)

দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে; এবারও মাওলানা মওদূদী পর্যাপ্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেন নি। একে তো কিছু কথা তিনি নিজে থেকে যোগ করেছেন,

তদুপরি ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ছাঁটাই করে পাঠকের অন্তরে অবাস্তব ধারণা দেয়ারও কোশেশ করেছেন। মাওলানা সাহেবের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। এবার প্রকৃত ঘটনা দেখুন। তার আগে বলে নেই; আদতেই হাজার বিন আদী (রাঃ) ছাহাবী কি না সে বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইবনে সাআদ ও মুসআব যোবায়রীর মত দু'একজন ঐতিহাসিক তাঁর ছাহাবিত্বের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও ইমাম বোখারীসহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাঁকে ছাহাবী নয়, তাবেয়ী বলেছেন। এমনকি ইবনে সা'আদও এক স্থানে তাঁকে তাবেয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। (তাবাকাত)

আল্লামা আবু আহমদ আসকারীর ভাষায়—

اكثر المحدثين لايصححون له صحبة

অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাঁর ছাহাবিত্ব স্বীকার করেন নি।

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫০)

তবে এ কথা সত্য যে, হাজার বিন আদী একজন উঁচু দরজার বুজুর্গ ও পরহেজগার তাবেয়ী ছিলেন। সেই সাথে এ কথাও সত্য যে রাফেজী ফেরকার গোলযোগপ্রিয় ও চরমপন্থী একটি চক্র তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো এবং তাঁর বুজুর্গী ও সরলতার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ইসলামী উম্মাহর সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঐক্য বিনষ্ট করার এবং নতুন সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটানোর পাঁয়তারা কষছিলো। দেখুন না; মাওলানার প্রিয় ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর লিখেছেন—

وقد التف على حجر جماعات من شيعة على يتولون امره ويشدون على يده ويسبون معاوية ويتبرء ون منه –

'হযরত আলীর (তথাকথিত) একদল উগ্র সমর্থক হাজার বিন আদীকে ঘিরে রেখেছিলো। তারাই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতো এবং হযরত মু'আবিয়াকে গালমন্দ করতো আর বলে বেড়াতো, 'ও বেটার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'[১]

আল্লামা ইবনে খালদুনও প্রায় একই কথা লিখেছেন।[২]

এ ফিতনাবাজ সুযোগসন্ধানীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র প্রতি হযরত হাজার বিন আদীর মন এতটাই বিষিয়ে উঠেছিলো যে,

১. আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫০
২. ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ২৩

ইসলামী উম্মাহর বহু কাঙ্ক্ষিত 'হাসান-মু'আবিয়া শান্তিচুক্তি' কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তৃতীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা আবু হানিফা দীনাওয়ারী লিখেছেন—

'ঐতিহাসিকদের মতে (শান্তিচুক্তির পর) প্রথম সাক্ষাতেই হাজার বিন আদী হযরত হাসানকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন এবং যুদ্ধে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'হে রাসূল-দৌহিত্র! হায়, এমন ঘটনা দেখার আগেই যদি আমার মরণ হতো! ইনসাফ থেকে জুলুমের পথে এবং অবিচল সত্য থেকে অপমানজনক মিথ্যার পথে তুমি আমাদের ঠেলে দিলে, আর যে নীচতা আমাদের জন্য শোভনীয় নয় তাই বেছে নিলে!'

এ ধরনের উত্তপ্ত কথা হযরত হাসানকে ব্যথিত করলো। তিনি তাকে শান্তি চুক্তির কল্যাণ ও শুভ দিক বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু কে বোঝে কার কথা! এরপর তিনি হযরত ইমাম হোসায়ন (রাঃ)-কে গিয়ে বললেন—

'দেখো, ইজ্জত ও মর্যাদা বিকিয়ে তোমরা অপমান ও যিল্লতি খরিদ করেছো। বিরাটকে বর্জন করে ক্ষুদ্রতার পথে চলেছো। সারা জীবন না হয় না শুনলে, আজ অন্তত আমার কথা শোনো। হাসানের কাপুরুষতার কথা বাদ দাও। তুমি কুফা ও অন্যান্য অঞ্চলের অনুগামীদের জামায়েত করো। আর গোটা ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। হিন্দার বাচ্চা (হযরত মু'আবিয়া) তখনই শুধু টের পাবে যখন আমাদের তলোয়ার তার গর্দানের উপর নেমে আসবে।'

হযরত হোসায়নও তাকে শান্ত ভাষায় বুঝালেন—

انا قد بايعنا وعاهدنا ولاسبيل الى نقض بيعتنا

'আমরা বাই'আত করে ফেলেছি, চুক্তি হয়ে গেছে। এখন তা ভঙ্গ করার কোন উপায় নেই।' (আল-আখবার তিওয়াল পৃঃ ২২০, প্রকাশ, কায়রো)

জান্নাতের যুবকদের দুই সরদার— হাসান ও হোসায়ন কারো কাছেই যখন কোন সমাদর পেলেন না, তখন হাজার বিন আদী কুফায় গিয়ে ডেরা ফেললেন। কুফা তখন ছিলো ফিতনাবাজ আব্দুল্লাহ বিন সাবার অনুচরদের কেন্দ্রস্থল। সাবাঈরা দৃশ্যতঃ হযরত আলী ও হাসানভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুরাগ-আনুগত্য দেখালেও তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিলো হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিয়ে সদ্য ঐক্যবদ্ধ উম্মাহকে পুনরায় সংঘর্ষের পথে টেনে আনা।

ইমামভ্রাতৃদ্বয় কিন্তু এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে সদ্য তীরে উঠে আসা উম্মাহকে নতুন করে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার 'যুক্তি' কিছুতেই মেনে নিতে

প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা প্রিয়তম নানা সাইয়েদুল মুরসালীনের শুভ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের মনে সদা জাগরূক ছিলো।[১]

অন্য দিকে আল্লামা দীনাওয়ারীর ভাষায় ইমামভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়ার আচরণ ছিলো—

'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইমামভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে মু'আবিয়া (রাঃ) অনভিপ্রেত কোন আচরণ যেমন করেন নি, তেমনি সন্ধির কোন শর্তও ভঙ্গ করেন নি। এমনকি মুহূর্তের জন্যও তাঁর সদাচরণে কোন পরিবর্তন ঘটে নি।[২]

মোটকথা, উভয় তরফে পূর্ণ সমঝোতা হয়ে গিয়েছিলো এবং কারো মনে কারো প্রতি কোন ক্ষোভ কিংবা বিক্ষোভ ছিলো না। কিন্তু ফিতনাবাজ সাবাঈদের মনে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি জ্বলছিলো প্রতিহিংসার আগুন। ইসলামী জাহানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতার মোবারক পরিবেশ তাদের মনের সে আগুন যেন আরো উস্‌কে দিচ্ছিলো। শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাই তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসেছিলো। ইমামভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিও ছিলো তাদের ভয়ঙ্কর আক্রোশ। কেননা তারা তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিতে রাজি হন নি।

হযরত হাসানের ওয়াফাতের পর এরা কুফা থেকে হযরত হোসায়নকে প্ররোচনামূলক যে চিঠি লিখেছিলো, তার অংশবিশেষ পড়ে দেখুন—

'অনুগামীদের দৃষ্টি এখন আপনার প্রতি নিবদ্ধ। যুদ্ধ বন্ধের যে নীতি হাসান অবলম্বন করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা অবগত। আমরা এও জানি যে, বন্ধুদের বেলায় আপনি যেমন কোমল, শত্রুদের বেলায় তেমনি কঠোর-ভীষণ এবং আল্লাহর ব্যাপারে অটল-অবিচল। যাই হোক এ বিষয়টি (খিলাফত) দাবী করা যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আমাদের এখানে চলে আসুন। আপনার অঙ্গুলিনির্দেশে মরণকে বরণ করে নিতে কৃতার্থ চিত্তে আমরা প্রস্তুত।'

কিন্তু তাদের সে আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে হযরত হোসায়ন সাফ জানিয়ে দিলেন—

لن يحدث الله به حدثا وانا حى

১. হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি। হযরত হাসান তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে, আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি বললেন— আমার এ পুত্র নেতাসুলভ গুণের অধিকারী। সম্ভবত আল্লাহ তাকে দিয়ে মুসলমানদের দুই বিরাট দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন। (বোখারী, কিতাবুচ্ছুলহ)

২. (আল আখবারুত্ তেওয়াল পৃঃ ২২১)

'আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহ তাঁর উপর কোন বিপদ পাঠাবেন না।'[১]

ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ চক্রটাই সরল বুজুর্গ হযরত হাজার বিন আদীর সাথে আঠালির মত লেগে ছিলো।[২]

পরিস্থিতির এই পটভূমি সামনে রেখে এবার মূল ঘটনায় আসুন। মাওলানা মওদূদীর দেয়া বরাতগ্রন্থগুলো থেকেই ঘটনার আদ্যোপান্ত পাঠকবর্গের খিদমতে আমরা পেশ করছি। তবে মাওলানা সাহেব যেসব ফাঁক ও ফারাক রেখে গেছেন সেগুলো আমরা অবশ্যই শুধরে নেবো এবং তাঁর চেপে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোও অনাবৃত করে দেবো।

আল্লামা ইবনে জরীর ও ইবনে কাছীরের মতে হাজার বিন আদী ও তাঁর অনুচরদের অভ্যাসই ছিলো—

انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقون فيه مقالة الجور وينتقدون على الامراء ويسارعون فى الانكار عليهم ويبالغون فى ذلك ويتولون شيعة على -

'হযরত উসমান সম্পর্কে মুখ খারাপ করে এরা অনাচারমূলক কথা বলতো। শাসকদের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যেতো। হযরত আলীর উগ্র সমর্থকদের সাথে এদের আঁতাত ছিলো। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাটা ছিলো এদের মুদ্রাদোষ।' (আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫৪)

আল্লামা ইবনে জারীর লিখেছেন—

হযরত মুগীরা বিন শো'বা একবার খোতবা দিতে দাঁড়িয়ে যথারীতি হযরত উসমানের জন্য রহমত ও মাগফেরাত কামনা করলেন।[৩] সেই মুহূর্তে হাজার বিন আদী হযরত মুগীরার বিরুদ্ধে এমন জোর চিৎকার দিলেন যে, মসজিদের ভিতরে ও বাইরে সবাই হতচকিত হয়ে গেলো। হযরত মুগীরাকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত শ্রুতিকটু ভাষা প্রয়োগ করে তিনি বললেন—

انك لاتدرى بمن تولع من هرمك ايها الانسان مر لنا بارزاقنا وعطياتنا فانك حبستها عنا وليس ذلك لك ولم يكن يطمع فى ذلك من كان قبلك وقد اصبحت مولعا بذم امير المؤمنين وتقريظ المجرمين -

১. আখবার তিওয়াল পৃঃ ২২২

২. আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫০

৩. মাওলানার ভাষায় এটাই হচ্ছে মিম্বরে হযরত আলীর উদ্দেশ্যে গালাগাল ও অভিসম্পাত বর্ষণ।

'মিয়াঁ! ভীমরতি ধরার কারণে তুমি ঠাওরাতে পারছো না, কার প্রতি অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করছো। আমাদের বন্ধ করে দেয়া ভাতাগুলো ফের জারি করে দাও। কেননা এগুলো আটকে রাখার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমার আগে কেউ তো এদিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয় নি। তুমি দেখছি আমীরুল মুমিনীনের (হযরত আলীর) কুৎসা এবং অপরাধীদের (হযরত উসমান) প্রশংসার ব্যাপারে বেশ দরাজদিল হে!'

এত কিছুর পরও হযরত মুগীরা বিন শো'বা নামাজ বাদ নীরব বদনে ঘরে ফিরে গেলেন। কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে তাঁকে বললেন, 'এ ধরনের বিপজ্জনক লোকদের ব্যাপারে উদাসীন থাকা কিছুতেই সমীচীন নয়', জবাবে হযরত মুগীরা বললেন, 'দেখো; অপরাধীদের ক্ষমা করাই আমার পছন্দ।'

পরবর্তীতে যিয়াদ বসরা ও কুফার প্রশাসক নিযুক্ত হলেন। তিনি একদিন হযরত উসমানের প্রশংসা করলেন এবং উসমান-ঘাতকদের অভিসম্পাত দিলেন।[1] হাজার বিন আদী যেন ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরী ছিলেন। উঠে

---

১. এটাই মাওলানা মওদুদীর ভাষায় রূপ পেয়েছে এভাবে– 'সে খোতবায় হযরত আলীকে গালি দিতো, আর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতেন।' অথচ মাওলানার দেয়া কোন বরাতগ্রন্থেই এ কথা নেই যে, যিয়াদ হযরত আলীকে গালি দিতো! তাবারীর বক্তব্য দেখুন–

ذكر عثمان واصحابه فقرظهم وذكر قتلته ولعنهم فقام حجر -

'তিনি উসমান এবং তাঁর অনুগামীদের প্রসঙ্গ টেনে তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের প্রসঙ্গ টেনে তাদের অভিসম্পাত দিলেন। তখনই হাজার দাঁড়িয়ে গেলেন।'

তাবারী, খঃ ৪ পৃঃ ১৯০।

এবার আল্লামা ইবনুল আছীরের বক্তব্য দেখুন–

ترحم على عثمان واثنى على اصحابه ولعن قاتليه فقام حجر -

'তিনি হযরত উসমানের জন্য করুণা প্রার্থনা করলেন এবং তার অনুগামীদের প্রশংসা করলেন আর তাঁর হত্যাকারীদের অভিসম্পাত দিলেন; তখন হাজার দাঁড়িয়ে গেলেন।' (খঃ ৩ পৃঃ ১৮৭)

এদিকে আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীরের বক্তব্য হলো–

وذكر فى اخرها فضل عثمان وذم من قتله واعان على قتله فقام حجر -

'খোতবার শেষ দিকে হযরত উসমানের গুণগরিমা বর্ণনা করলেন এবং ঘাতক ও তাদের সহযোগীদের অভিসম্পাত দিলেন। তখন হাজার দাঁড়িয়ে গেলেন।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫১)

আল্লাম ইবনে খালদুনও অভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন–

ترحم على عثمان ولعن قاتليه وقال حجر -

'তিনি হযরত উসমানের জন্য করুণা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের অভিসম্পাত

দাঁড়িয়ে গড় গড় করে সেই কথাগুলোই তিনি আউড়ে গেলেন যা একদিন হযরত মুগীরাকে বলেছিলেন। যিয়াদ সেই মুহূর্তে তাকে কিছুই বললেন না।

ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে–

'পরে যিয়াদ হযরত হাজার বিন আদীকে একান্তে ডেকে বললেন, জিহ্বাকে সংযত রেখে আপন গৃহকোণকেই যথেষ্ট মনে করুন। এই আমার গদি আপনার জন্য হাজির। আপনার যাবতীয় প্রয়োজন আমি দেখবো। কিন্তু তার আগে আপনার সম্পর্কে আমি আশ্বস্ত হতে চাই। কেননা আপনার চঞ্চলচিত্ততা আমার অজানা নয়। হে আব্দুর রহমানের পিতা! আল্লাহর দোহাই! এই হীনস্বভাব ও নির্বোধদের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এরা আপনাকে আপনার নিজস্ব মত থেকে হটিয়ে দিতে পারে। এরপর যদি আমার চোখে আপনি খাটো হয়ে যান তাহলে সেটা আমার দোষ নয়।' (তাবাকাত খঃ ৮ পৃঃ ২১৮)

সব কথা শুনে হাজার বিন আদী 'বুঝতে পেরেছি' বলে ঘরে ফিরে এলেন। ফিরে এসে কিন্তু আর বুঝতে পারলেন না। শিয়া বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, আমীর কী কী বললেন? তিনি তাদের আগাগোড়া সব শোনালেন। শিয়া বন্ধুরা তাতে মন্তব্য করলো, 'আসলে তিনি আপনার কল্যাণের কথা বলেন নি।' (আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫৩)

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, 'হযরত আমর বিন হোরায়ছ (রাঃ)-কে কুফায় নিজের ভারপ্রাপ্ত করে যিয়াদ একবার বসরা রওয়ানা হলেন। সতর্কতার খাতিরে হাজার বিন আদীকেও তিনি সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত তুলে সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। যিয়াদ তখন জ্বলে উঠে বললেন–

'আসলে হৃদয়, বিবেক ও ধর্ম, সব দিক থেকেই তুমি অসুস্থ। আল্লাহর কসম! এবার যদি কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি করো, তাহলে আমিও তোমার ভিতরের 'লাল পদার্থ' বের করার ব্যবস্থা করবো।' (আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫১)

ইমাম ইবনে সা'আদ লিখেছেন, 'যিয়াদের অনুপস্থিতির সুযোগে হাজার বিন আদীর বাড়ীতে শিয়া বন্ধুদের আনাগোনা বেড়ে গেলো। তারা তাঁকে এই বলে প্ররোচিত করতে লাগলো–

দিলেন, তখন হাজার বলে উঠলেন।' (খঃ ৩ পৃঃ ২৩)

আর আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ তো মূল খোতবারই কোন উল্লেখ করেন নি। এমতাবস্থায় যিয়াদকর্তৃক হযরত আলীকে গালমন্দ করার দাবীকে মাওলানা সাহেবের উর্বর মস্তিষ্কের সবুজ ফসল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! আমরা অবশ্য বলবো, এটা মাওলানা সাহেবের 'অনিচ্ছাকৃত' ভুল এবং মানুষ ভুল করতেই পারে, তবে সতর্ক থাকা ভালো।

انك شيخنا واحق الناس بانكار هذا الامر -

'আপনি আমাদের মুরশিদ, সুতরাং এ বিষয়ের (হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতের) বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার আপনারই বেশী।'

এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই হাজার বিন আদী মসজিদে যেতেন। ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক, হাজার বিন আদীর পরিবর্তিত গতিবিধি সম্পর্কে কৈফিয়ত চেয়ে লোক পাঠালেন। কিন্তু হাজার বিন আদী পত্রপাঠ তাকে জবাব দিলেন, 'যে অন্যায় কর্মে তোমরা মজে আছো, তা থেকে সরে এলেই বরং ভালো করবে।'

সব দেখে শুনে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হযরত আমর বিন হোরায়ছ (রাঃ) যিয়াদকে এই মর্মে জরুরী বার্তা পাঠালেন যে, 'কুফাকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে চলে আসুন'। (তাবাকাত কঃ ৮ পৃঃ ২১৮)

ইমাম ইবনে সা'আদ এরপর লিখেছেন—

'খবর পেয়ে যিয়াদ ঝড়ের বেগে কুফায় ফিরে এলেন। প্রথমে তিনি দাতা হাতম তাইয়ের পুত্র, বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আদী (রাঃ)[১] সহ কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে বললেন, 'শেষবারের মত আপনারা তাকে বুঝিয়ে আসুন এবং সংযত হতে বলুন।'

সকলে হাজার বিন আদীকে বিভিন্নভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিছুই শুনতে পান নি, ভাব ধরে গোলামের সাথে উটের পরিচর্যাসংক্রান্ত 'জরুরী' আলাপ শুরু করলেন। অবস্থা দেখে হযরত আদী বিন হাতিম হতবাক হলেন, বললেন—

'তুমি পাগল নাকি হে! আমি তোমার সাথে কথা বলছি 'পরিস্থিতি' নিয়ে, আর তুমি কিনা ঝুলে আছ তোমার উটের লেজ ধরে!'

পরে হযরত আদী সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার ধারণা ছিল না যে, এ বেচারা বার্ধক্য ও দুর্বলতার এমন শোচনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে।'

ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে এঁরা সবাই ফিরে এলেন। তবে যিয়াদের কাছে অনেক বিষয় গোপন করে তাকে নমনীয় হতে উপদেশ দিলেন। যিয়াদ কিন্তু বেঁকে বসে বললেন, 'এর পরও যদি তার সাথে নম্র আচরণ করি, তাহলে আমি, আমি আবু সুফয়ানের পুত্র নই।'

---

১. জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইনি হযরত আলীর সমর্থক ছিলেন এবং হযরত মু'আবিয়ার দরবারে কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে দৃপ্ত ভাষায় সে কথা ঘোষণাও করেছেন।

পরের জুমু'আয় যিয়াদ মিম্বরে উঠে বসলেন এবং অনুগামী-বেষ্টিত হাজার বিন আদীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মনে রেখো; অনাচার ও বিদ্রোহের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আমার নমনীয়তার সুযোগে দল পাকিয়ে এরা (হাজার ও তার অনুগামীরা) বেশ উদ্ধত হয়ে উঠেছে। আল্লাহর কসম! ভালোয় ভালোয় সোজা পথে ফিরে না এলে তোমাদের উপযুক্ত এলাজই আমি করবো। হাজারের বিপদ থেকে কুফার জমীন যদি আমি নিরাপদ করতে না পারি, যদি তাকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে না পারি তবে আমি নস্যি।' (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১১৯০ ; ইবনুল আছীর খঃ ৩ পৃঃ ১৮৭, আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫১)

হাফেজ ইবনে কাছীরের মতে এরপর যিয়াদ নরম ভাষায় বললেন—

ان من حق امير المؤمنين يعنى كذا وكذا -

দেখো; তোমাদের উপর আমীরুল মুমিনীনের অমুক অমুক অবদান রয়েছে।

এ কথার জবাবে হাজার বিন আদী যিয়াদের গায়ে এক মুঠি পাথর ছুঁড়ে বললেন—

كذبت عليك لعنة الله -

মিথ্যুক! তোর প্রতি আল্লাহর লানত। (আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫১)

যিয়াদ তখন মিম্বর থেকে নেমে নামাজ পড়ালেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে যিয়াদের খোতবা অস্বাভাবিক দীর্ঘ হওয়ার কারণেই হাজার বিন আদী পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

কারণ যাই হোক; যিয়াদ তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে সব ঘটনা লিখে জানালেন। উত্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হুকুম পাঠালেন, 'হাজার ও তার সাথীদের গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯০, আল বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫১, আল ইসতী'আব খঃ ৩ পৃঃ ৩৫৫)

আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পেয়ে যিয়াদ কুফার পুলিশবাহিনীপ্রধান শাদ্দাদ ইবনুল হয়ছাম মারফত হজার বিন আদীকে ডেকে পাঠালেন।

পরিস্থিতির এই নাজুক মুহূর্তে যিয়াদ পুলিশপ্রধানকে নির্দেশ দিলেন, 'সাথে পুলিশ নিয়ে যাও। তিনি স্বেচ্ছায় আসতে রাজি হলে ভালো। অন্যথায় নির্দ্বিধায় শক্তি প্রয়োগ করবে।'

কিন্তু হাজার বিন আদীর অনুগামীদের একই কথা; 'আমীরের হুকুম আমরা মানি না।'

ফলে উভয় তরফে তীব্র সংঘর্ষ হলো এবং পুলিশদল পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেলো।

এ ঘটনার পর হাজার বিন আদী কুফা থেকে ফেরার হয়ে নিজ মহল্লা কিন্দায় আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে পুরোদমে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেখানে তার গোত্রের লোকেরাই শুধু আবাদ ছিলো। জনৈক কায়েস বিন কাহদান গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী 'যুদ্ধ-কবিতা' আবৃত্তি করে স্থানীয় লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। ফলে অত্যল্প কালের মধ্যে গোটা বস্তিতে এক ভয়াবহ যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি হয়ে গেলো। কায়স বিন কাহদানের কবিতা শুনুন—

يا قوم حجر دافعوا وصاولوا　　وعن اخيكم ساعة فقاتلوا

لايلفين منكم لحجر خاذل　　اليس فيكأم رامح ونابل

وفارس مستلم وراجل　　وضارب بالسيف لايزايل

হাজারের আপনজনেরা কে কোথায়, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আপন ভাইয়ের পক্ষে লড়াই শুরু করো। হাজারকে নিঃসঙ্গ ফেলে কেউ যেন সরে না দাঁড়ায়। এখানে কি পাকা তীরান্দাজ ও নেযাবাজ নেই? নেই মজবুত ঘোড়সওয়ার, সাহসী পদাতিক কিংবা তলোয়ার হাতে লড়াকু সৈনিক?'

(তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯৩)

যাই হোক, কিন্দাহ বস্তিতে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে প্রেরিত যিয়াদের বাহিনীর সাথে হাজার বিন আদীর সমর্থকদের তুমুল যুদ্ধ হলো। কিন্তু হাজার বিন আদী সেখান থেকেও ফেরার হয়ে আত্মগোপন করলেন।[১]

আর কোন উপায় না দেখে যিয়াদ মুহাম্মদ বিন আশআছকে তলব করে গজবের স্বরে বললেন, 'তিন দিনের মধ্যে হাজারকে চাই, নইলে তোমার উপায় নাই।'

মুহম্মদ বিন আশআছ এরপর একদল ঘোড়সওয়ার নিয়ে হাজার বিন আদীর সন্ধানে সর্বত্র চষে ফেলতে শুরু করলেন। ফলে 'কোনঠাসা' হাজার বিন আদী তাঁকে নিরাপদে দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন এবং যিয়াদের মজলিসে হাজির হলেন। যিয়াদ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—

১. আল্লামা তাবারী ১৯০ থেকে ১৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিন্দা যুদ্ধ ও হাজার বিন আদীর আত্মগোপনসংক্রান্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

'মারহাবা হে হাজার! যুদ্ধকালীন সময়ের মত সন্ধির সময়ও তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছো?

উত্তরে হাজার বললেন, 'আনুগত্য থেকে আমি সরে দাঁড়াই নি। জামা'আত থেকেও বিচ্ছিন্ন হই নি।'

যিয়াদ বললেন, 'হাজার! দুঃখ এই যে, এক হাতে তুমি খঞ্জর চালাও, আর অপর হাতে প্রলেপ লাগাও। তোমার মতলব বুঝি এই যে, কাবুতে পেয়েও আমরা তোমার সাথে উত্তম আচরণ করি!'

হাজার বিন আদী পেরেশান হয়ে বললেন, 'তুমি কি আমাকে মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দাও নি?' যিয়াদ তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কেন নয়? আমার প্রতিশ্রুতি আমি অটুট রাখবো।'

এই বলে যিয়াদ তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। এরপর কুফার চার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হযরত আমর বিন হোরায়ছ, হযরত খালেদ বিন আরফাতাহ, হযরত আবু বোরদাহ বিন আবু মূসা ও কায়স বিন ওয়ালিদকে ডেকে বললেন,

'হাজারের যে সব আচরণ আপনারা দেখলেন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিন।'

আল্লামা তাবারীর মতে উক্ত চারজন নিম্নলিখিত যুক্তসাক্ষ্য দিলেন—

ان حجرا جمع أليه الجموع واظهر شتم الخليفة ودعا الى حرب امير المؤمنين وزعم ان هذا الامر لايصلح الا لال ابى طالب ووثب بالمصر واخرج عامل امير المؤمنين واظهر عذر ابى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه واهل حربه وان هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس اصحابه وعلى مثل رايه وامره ـ

'হাজার তার চারপাশে একটি চক্র তৈরী করে আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়েছে। তার ধারণায় আবু তালিবের পরিবার ছাড়া আর কেউ খেলাফতের যোগ্য নয়। গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীনের প্রশাসককে সে নাজেহাল করেছে। আবু তোরাব (হযরত আলী রাঃ)-কে সে নির্ভুল দাবী করে, তাঁর জন্য করুণা প্রার্থনা করে এবং তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। তার চারপাশে যারা আছে তারাই তার দলের মূলশক্তি এবং তার মত ও পথের অনুসারী।'

এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক সভা ডেকে যিয়াদ ঘোষণা করলেন, 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে কেউ সাক্ষী-তালিকায় নাম লেখাতে পারে।' এতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পড়লো যে, এক পর্যায়ে তালিকাভুক্ত নামের সংখ্যা সত্তরের কোটা ছাড়িয়ে গেলো। কিন্তু যিয়াদ এমন চৌচল্লিশটি নাম শুধু অনুমোদন করলেন যাদের ধার্মিকতা, নৈতিকতা ও পারিবারিক মর্যাদা ছিলো সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯৩-২০১)

কয়েকজন সাক্ষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথম সাক্ষী হযরত আমর বিন হোরায়ছ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতকালে তাঁর বয়স সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও তাঁর ছাহাবিত্ব সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার অবশ্য তাকে প্রবীণ ছাহাবীরূপে উল্লেখ করে জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন। কয়েকটি হাদীছ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি এবং আরও বেশ কিছু হাদীছ হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও অনান্য বিশিষ্ট ছাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ খঃ ৬ পৃঃ ২৩, তাহযীববুত তাহযীব খঃ ৭ পৃঃ ১৭, তাজরীদে আসমায়ে ছাহাবা, ইবনুল আছীরকৃত খঃ ১ পৃঃ ৪৩৫)

দ্বিতীয় সাক্ষী হলেন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত খালিদ বিন আরফাতা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর সরাসরি কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। ইতিহাসখ্যাত কাদেসিয়া যুদ্ধের তিনি ছিলেন সহকারী প্রধান সেনাপতি। তাঁকে বাহিনী-পরিচালক নিযুক্ত করার জন্য খোদ হযরত ওমর (রাঃ) কাদেসিয়ার মহানায়ক হযরত সা'আদ (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত সা'আদ কিছুদিন তাঁকে কুফায় নিজের নায়েবও নিযুক্ত করেছিলেন।

তৃতীয় সাক্ষী হলেন প্রসিদ্ধ ছাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-র প্রিয়পুত্র হযরত আবু বুরদাহ। ছাহাবী না হলেও তিনি ছিলেন আলী (রাঃ)-র প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। ছাহাবাদের সূত্রে অসংখ্য হাদীছ তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। এছাড়া বেশ কিছুদিন কুফার বিচারকের গুরু দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়েছেন। ইমাম ইবনে সা'আদ তাঁকে অসংখ্য হাদীছ বর্ণনাকারী এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আযালীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবাকাত খঃ ৬ পৃঃ ২১, আল-ইসাবাহ খঃ ১ পৃঃ ৪০৯, তাহযীব খঃ ৩ পৃঃ ১০৬)

চতুর্থ সাক্ষী হলেন হযরত কায়স ইবনুল ওয়ালিদ। তাঁর পরিচয় আমরা জানতে পারি নি।

পঞ্চম সাক্ষী হলেন ওয়াইল ইবনে হাজার (রাঃ)। ইনি অসংখ্য হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট ছাহাবী। (আল ইছাবাহ্ খঃ ৩ পৃঃ ৫৯২, আল-ইসতী'আব খঃ ৩ পৃঃ ৬০৫, তাবাকত খঃ ৬ পৃঃ ২৬)

ষষ্ঠ ব্যক্তি হলেন, হযরত কাছীর বিন শিহাব (রাঃ)। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ দ্বিধান্বিত হলেও আল্লামা ইবনে আসাকির ও হাফিয ইবনে হাজার তাঁর ছাহাবিত্বের পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কোন এক অঞ্চলের আমীরও নিযুক্ত করেছিলেন। (আল ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ২৭১, আল-ইসতী'আব খঃ ৩ পৃঃ ৩০০, তাবাকাত খঃ ৬ পৃঃ ১৪৯)

সপ্তম ব্যক্তি হলেন, হযরত মূসা বিন তালহা। ইনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী হযরত তালহার পুত্র। ইমাম আবু হাতিম বলেন, পুত্র সন্তানদের মধ্যে মুহম্মদের পর তিনি ছিলেন হযরত তালহার প্রিয়তম এবং সে যুগের মানুষ তাঁকে হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করতো।

ইমাম আযালী, হযরত মুররাহ, ইবনে খাবাস ও ইমাম ইবনে সা'আদ প্রমুখের মতে তিনি ছিলেন হাদীছ বর্ণনায় পরম যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের অন্যতম। (তাবাকাত খঃ ৬ পৃঃ ২১২)

অষ্টম ব্যক্তি হলেন হযরত তালহার অপর পুত্র বিশিষ্ট হাদীছ বর্ণনাকারী ইসহাক বিন তালহা। ইমাম ইবনে হাব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। (তাহযীবুত্তাহযীব খঃ ১ পৃঃ ২৩৮)

এরপর অন্যান্য সাক্ষীর পরিচয় দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। বলাবাহুল্য যে, সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কারো উপর বিন্দুমাত্র চাপ প্রয়োগ করা হয় নি। কেননা তাবারীর বর্ণনা মতে মুখতার, আবু ওবায়দ ও হযরত মুগীরার পুত্র ওরওয়াহকেও সাক্ষী দিতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করায় তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি?

(তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২০১)

শরীয়তসম্মত পন্থায় সাক্ষী-তালিকাসহ অভিযুক্ত হাজার বিন আদী ও তাঁর বারজন অনুগামীকে হযরত হাজার বিন ওয়াইলের তত্ত্বাবধানে দামেস্কে পাঠানো হলো।

হাজার বিন আদীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আগে থেকেই পূর্ণ অবগত ছিলেন। এবার ছাহাবী ও তাবেয়ীদের সম্মিলিত চৌচল্লিশটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষী তাঁর কাছে বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দিলো। হাজার ও তাঁর অনুগামীদের বিদ্রোহ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেলো। আর

শরিয়তের বিধান মতে আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তা সত্ত্বেও ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রায় ঘোষণার ব্যাপারে কোন রকম তাড়াহুড়া করেন নি। যিয়াদের নামে এক পত্রে তার মন্তব্য ছিল এই—

'হাজার ও তার অনুগামীদের সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আমি উপলব্ধি করেছি এবং সাক্ষীনামা ও সাক্ষী-তালিকাও দেখেছি। এ সম্পর্কে এখন আমি চিন্তা-ভাবনা করছি। কখনো মনে হয়, মৃত্যুদণ্ডই হয়তো এদের জন্য উপযোগী; আবার কখনো মনে হয় তার চেয়ে ক্ষমা প্রদর্শনই বুঝি উত্তম।'

উত্তরে যিয়াদ লিখলেন—

'আপনার দ্বিধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি; অথচ যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তারাই এদের সম্পর্কে ভালো জানেন। মোটকথা, এই (কুফা) শহরের যদি আপনার প্রয়োজন থাকে, তাহলে হাজার ও তার অনুগামীদের আমার কাছে ফেরত পাঠাবেন না।' (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২০৩)

এতদ্সত্ত্বেও দু'একজন ছাহাবীর সুপারিশক্রমে অভিযুক্তদের মোট ছয়জনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে বাকী আটজনের বিরুদ্ধে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করলেন। কেউ একজন হাজার বিন আদী সম্পর্কেও সুপারিশ করলো। কিন্তু তিনি এই যুক্তিতে রায় বহাল রাখলেন যে, সুযোগ পেলেই এ লোক শহরে গোলযোগ সৃষ্টি করবে। (তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২০৪)

হযরত হাজার বিন আদীর দ্বীনদারী ও ধার্মিকতার খ্যাতি ছিলো সর্বত্র। তাই মৃত্যুদণ্ডাদেশের খবর শোনামাত্র উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) দণ্ড মওকুফের অনুরোধ জানিয়ে হযরত মু'আবিয়ার নামে জরুরী বার্তা পাঠালেন। মা আয়েশার পয়গাম এমন সময় এসে পৌঁছলো, যখন হাজার বিন আদীকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হয়ে গেছে। তবু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু ততক্ষণে তাকদীরের ফায়সালা কার্যকর হয়ে গেছে এবং জল্লাদের তলোয়ার হাজার বিন আদীর রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।[১]

হাজার বিন আদীর মৃত্যুদণ্ডের— এবং 'বন্ধুদের' ভাষায় হত্যাকাণ্ডের— এ বিবরণ মাওলানা মওদূদী-নির্দেশিত উৎসগ্রন্থগুলো থেকেই আমরা সংগ্রহ করেছি। মাওলানার আরেকটি প্রিয় উৎস হলো তাবারী, কিছু কিছু উপাদান সেখান থেকেও আমরা নিয়েছি। মজার ব্যাপার এই যে, তাবারীর প্রায় সবক'টি

১. তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২০৪

বর্ণনারই সূত্রমুখে রয়েছেন কট্টর শিয়াপন্থী আবু মুহান্নাফ। আর এই সাধু পুরুষটি সম্পর্কে আগেই আমরা বলে এসেছি যে, হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের কোন ইমামই তাকে ভালো চোখে দেখতে রাজী নন। কেননা, খুব বেশী ঠেকায় না পড়লে সত্য কথা বলার অভ্যাস ছিলো না তার। তদুপরি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র প্রতি এই শিয়া বর্ণনাকারীর ছিলো জাতবিদ্বেষ।

সেই আবু মুহান্নাফ হাজার বিন আদীর মৃত্যুদণ্ডের যে বিবরণ ইতিহাসের পাতায় আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাই আমরা হুবহু তুলে ধরেছি। অথচ মাওলানা মওদূদী সাহেব আলোচ্য ঘটনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ছাঁটাই করে পাঠক হৃদয়ে এই অবাস্তব ধারণা দিতে চেয়েছেন যে—

১. হাজার বিন আদীর আদতেই কোন অপরাধ ছিলো না।

২. হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ও যিয়াদ বিন আবু সুফয়ানই ছিলেন আসল অপরাধী। কেননা, জুমু'আর খোতবায় হযরত আলীকে গালমন্দ করে মুসলিম জনসাধারণের কোমল অনুভূতিতে বারবার তারা নির্দয় আঘাত হানছিলেন।

৩. হাজার বিন আদীর অপরাধ শুধু এই যে, ধৈর্যের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন।

৪. সাক্ষী প্রসঙ্গে এসে মাওলানা সাহেবের নাক সিঁটকানো দেখে মনে হয়, গোটা ব্যাপারটা সাজানো গোছানো একটা প্রহসন মাত্র। যেন এ যুগের পেশাদার আদালতী সাক্ষীদের মতই পয়সা খেয়ে এরা নিজেদের ঈমান হজম করেছিলেন।

৫. হাজার বিন আদী ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে আনীত বিদ্রোহের অভিযোগটি ছিলো আগাগোড়া বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

৬. নিছক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছিলেন।

এরপর মাওলানার উর্বর মস্তিষ্ক ও বিরল লেখনী-প্রতিভা দুয়ে দুয়ে চারের মত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মানুষের মুখে তালা ঝুলিয়ে এবং বিবেকের টুঁটি চেপে ধরে স্তব্ধ করা হয়েছিলো সকল প্রতিবাদী কণ্ঠ, আর সত্য ভাষণের একমাত্র পুরস্কার ছিলো নির্মম মৃত্যু।

পক্ষান্তরে আমাদের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, 'দুইয়ে দুইয়ে এখানে চার নয়, বাইশ।' কারণ একই উৎসগ্রন্থ থেকে আমাদের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে—

১. হাজার বিন আদী ও তার অনুগামী দল প্রতিষ্ঠিত ও বৈধ খিলাফতের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণকারী ছিলেন।

২. ইমামভ্রাতৃদ্বয় ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মাঝে পূর্ণ সমঝোতা হওয়ার পরও হাজার বিন আদী সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য বারবার ইমামভ্রাতৃদ্বয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ইমামভ্রাতৃদ্বয় সে অন্যায় চাপের মুখে নতি স্বীকার না করায় তাঁদেরও প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

৩. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র কোন প্রশাসক হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে গালি বা অভিসম্পাত ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন, ইতিহাসের পাতায় এর কোন প্রমাণ নেই।

৪. পক্ষান্তরে ইতিহাস বলে, হাজার বিন আদীর দল হযরত উসমান ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও অভিসম্পাত বর্ষণের কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না।

৫. কথায় কথায় এবং সামান্য অজুহাতে প্রশাসকদের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টি করা যেন হাজার ও তার অনুগামী দলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

৬. হযরত মুগীরা এবং প্রথম দিকে যিয়াদ যুক্তি ও নমনীয়তার পথ ধরে হাজার বিন আদীকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

৭. একান্ত বৈঠকে হাজার বিন আদী কোন অভিযোগ পেশ না করে যিয়াদের সব কথা মেনে নিলেও দলের মাঝ ফিরে এসে তিনি তার আপত্তিকর কর্মকাণ্ড বদস্তুর অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হযরত আমর বিন হোরায়ছকে পাথর ছুঁড়ে নাজেহাল পর্যন্ত করেছেন।

৮. এত কিছুর পরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে যিয়াদ বিশিষ্ট ছাহাবীদের পাঠিয়ে তাঁকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, তাঁর অশিষ্ট আচরণে হযরত আদী বিন হাতেম পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমার ধারণায়ও ছিলো না যে, বার্ধক্য-দুর্বলতার এমন শোচনীয় পর্যায়ে এসে গেছে এ লোক।'

৯. সবশেষে যিয়াদ তাঁকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী দিয়ে বললেন, 'এখনো যদি তোমরা সোজা পথে না আসো, তাহলে তোমাদের উপযুক্ত এলাজের ব্যবস্থা আমি করবো।' সেই সাথে যুক্তির ভাষায় বললেন, 'দেখো; তোমাদের উপর আমীরুল মুমিনীনের অমুক অমুক অবদান রয়েছে।' কিন্তু জবাবে যিয়াদ পেলেন এক মুঠি কংকর, আর একটা অভিসম্পাত।

১০. কুফার প্রশাসক হিসাবে যিয়াদ তাকে তলব করলে পরিষ্কার ভাষায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। দ্বিতীয়বার লোক পাঠানো হলে তারাও গালমন্দ হজম করে ফিরে এলো।

১১. তৃতীয় দফায় পুলিশপ্রধানের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ লড়ে হাজার ও তাঁর অনুগামী দল কুফা থেকে ফেরার হলেন।

১২. এরপর তারা কিন্দাহ বস্তিতে জড়ো হয়ে ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করলো। গরম বক্তৃতা ও জঙ্গী কবিতার মাধ্যমে গোটা অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিলো। শেষে যিয়াদের বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধের পর হাজার বিন আদী সেখান থেকেও গা ঢাকা দিলেন।

মজার ব্যাপার এই যে, গ্রেফতারীর পর 'সত্যভাষী' এই হাজার বিন আদীই অবলীলাক্রমে বললেন,'বাই'আতের উপর আমি অবিচল আছি।'

১৪. চৌচল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হাজার বিন আদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাক্ষী দিয়েছেন। এদের মধ্যে যেমন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ফোকাহা ও মুহাদ্দিছীনের এক বিরাট জামা'আত। আর তাঁদের উপর চাপ প্রয়োগের কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই।

১৫. গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাতজন অনুগামীসহ হাজার বিন আদীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন।

সত্য কথা বলতে কি, হাজার বিন আদী ও তাঁর অনুগামী দলের এ সব কাণ্ডকীর্তির নাম যদি হয় স্বাধীন মত প্রকাশ ও সত্যভাষণ, তাহলে বিদ্রোহ, গোলযোগ ও অরাজকতা ধরনের শব্দগুলো অভিধান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় না করে কোন উপায় থাকবে না।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মাওলানা মওদূদী মূল অকুস্থল কুফার ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর দেয়ার বিন্দুমাত্র গরজ অনুভব করেন নি।[১] বরং মূল ঘটনাপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শত শত মাইল দূরে অবস্থানকারী খোরাসানী প্রশাসক রাবী বিন যিয়াদ হারেসীর এক আবেগতাড়িত মন্তব্য আঁকড়ে ধরেছেন। অথচ আগেই আমরা বলে এসেছি যে, হাজার বিন আদীর পরহেজগারী ও ধার্মিকতার খ্যাতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এমতাবস্থায় ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কে অনবগত যে কারো পক্ষেই হাজার বিন আদীর

---

১. হে মু'আবিয়া! হাজারকে হত্যা করতে গিয়ে তোমার মনে কি আল্লাহর ভয় জাগে নি?

মৃত্যুদণ্ডের সংবাদে মর্মাহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর সেই সাথে অপপ্রচারের 'টক-ঝাল' শামিল হলে তো কথাই নেই। সুতরাং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে এটা একেবারেই অচল। কেননা পরহেজগারী ও ধার্মিকতার যত ঊর্ধ্বলোকেই হাজার বিন আদী অবস্থান করুন, ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সাজা তাকে পেতেই হবে। ধার্মিকতার সুবাদে কারো তিন চারটা খুন মাফ হলেও সাত খুন তো আর মাফ হতে পারে না। একইভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-র একটি মন্তব্যও মাওলানা সাহেব কাজে লাগাতে চেয়েছেন। অথচ তিনিও মূল ঘটনাপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সুদূর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন। তদুপরি তাঁর মন্তব্যের শব্দমালা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতবিরোধ রয়েছে।

তাবারীর এক স্থানে অবশ্য মাওলানা মওদূদীর তরজমাকৃত শব্দগুলোই রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনুল আছীর, ইবনে কাছীর, ইবনে সা'আদ, ইবনে আব্দুল বার ও ইবনে খালদুনের মতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-র মন্তব্য হলো—

اين كان حلمك عن حجر -

হাজারের ব্যাপারে তোমার সহনশীলতা কোথায় গিয়েছিলো? (ইবনুল আছীর খঃ ৩ পৃঃ ১৯৪, ইবনে খালেদুন খঃ ৩ পৃঃ ২৯)

মাওলানা সাহেবের হয়ত চোখে পড়ে নি, তবে খোদ তাবারীতেও এ বর্ণনাটি রয়েছে। (খঃ ৩ পৃঃ ১৯১)

সুতরাং আমাদের মতে এতগুলো ইতিহাস-গ্রন্থের সম্মিলিত বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে তাবারীর একটি মাত্র বর্ণনার প্রতি মাওলানার এ অহেতুক দুর্বলতা বেশ দৃষ্টিকটু। খোদ তাবারীতেই যখন দ্বিতীয় বর্ণনার সমর্থন রয়েছে তখন প্রথম বর্ণনাটিকে দ্বিতীয়টির পরিবর্তিত রূপ বলে খুব সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যেতো। সে জন্য কেউ তাঁকে খারাপ বলতো না। সম্ভবতঃ গোড়া থেকেই তিনি ভুলে (?) বসে আছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের এক ছাহাবা সম্পর্কে তিনি কলম বাগিয়ে ধরেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-র 'সহনশীলতা' শব্দটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, তাঁর দৃষ্টিতেও হযরত মু'আবিয়ার এ সিদ্ধান্ত ইনসাফ বা শরীয়তের পরিপন্থী ছিলো না। খুব বেশী হলে এটা তাঁর সর্বজনস্বীকৃত সহনশীলতার পরিপন্থী ছিলো।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-র মন্তব্যের পাশাপাশি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বক্তব্যও ইতিহাস ধরে রেখেছে। মাওলানা সাহেব 'কিছু একটা ভেবে' সে কথা চেপে গেলেও আমরা তা লুকিয়ে রাখতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি স্বীকৃত ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জবাবে তিনি বলেছিলেন—

انما قتله الذين شهدوا عليه -

আসলে হত্যা তো তারাই করেছে যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।[১]

তিনি আরো বলেছেন—

'আমি কী করবো? যিয়াদ তো এতদূর লিখেছে যে, এদের ছেড়ে দেয়া হলে আমার হুকুমতের বিরুদ্ধে এমন বিরাট ফাটল এরা সৃষ্টি করবে, যা আর জোড়া লাগানো সম্ভব হবে না।'

সবশেষে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মা আয়েশা (রাঃ)-কে তিনি এতদূর বললেন—

فدعيني وحجرا حتى نلقى عند ربنا -

'আমাদের উভয়কে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে দিন।'[২]

غدا لى ولحجر موقف بين يدى الله عزوجل -

'হাজার ও আমি, আমরা উভয়ে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো।'

মাওলানা মওদূদীর ভাষায়—

'হত্যার পূর্বে জল্লাদ তাকে বললো, আলীকে অভিসম্পাত দিতে রাজী হলে আমাদের প্রতি তোমাকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম রয়েছে।' কিন্তু হাজার বিন আদী ঘৃণাভরে তাদের জানিয়ে দিলেন, 'যে কথায় আমার আল্লাহ নারাজ হবেন সে কথা আমি কি করে বলতে পারি?'

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, জল্লাদ ও হাজারের এ বাক্য বিনিময় শুধু আল্লামা তাবারী শিয়াপন্থী আবু মুহান্নাফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সনদ ও যুক্তি উভয় বিচারেই এ বর্ণনা 'অস্পৃশ্য'। তাছাড়া আবু মুহান্নাফকে সত্যবাদী সাধুপুরুষ স্বীকার করে নিলেও মাওলানা মওদূদীকে এ কয়টি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে—

১. আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৫৩
২. আল-ইসতী'আব খঃ ১ পৃঃ ৩৫৬

১. হাজার বিন আদীর পরহেজগারী ও ধার্মিকতার এত যে খ্যাতি, তিনি কি শরীয়তের এ নির্দেশ জানতেন না যে, শিরক ছাড়া অন্য কোন পাপ কাজে প্রাণের হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হলে সে কাজটি করে প্রাণরক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে?

২. আবু মুহান্নাফের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়; হযরত আলীকে গালমন্দ না করাটাই বুঝি হাজারের প্রতি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র সমস্ত আক্রোশের মূল। অথচ পিছনে আমরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে এসেছি যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কিংবা তাঁর কোন সাথী এধরনের ঘৃণ্য কাজ কখনো করেন নি।

৩. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মত বিচক্ষণ রাষ্ট্র পরিচালকের কাছে মাওলানা সাহেব এমন শিশুসুলভ আচরণ কিভাবে আশা করেন যে, কুফায় উদ্বেগজনক গোলযোগ সৃষ্টিকারী এবং কিন্দার বস্তিতে সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক হাজার বিন আদী 'জান বাঁচানো ফরজ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে হযরত আলীকে একটা মৌখিক গালি দেবেন আর অমনি খোশ দিলে মু'আবিয়া তাকে ছেড়ে দেবেন? ভুলে যাবেন অতীত কার্যকলাপ ও ভবিষ্যৎ বিপদ সম্ভাবনার কথা? এই বুদ্ধি নিয়েই বুঝি একে একে এতগুলো বছর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি!

৪. হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণের গল্পটা আবু মুহান্নাফ এমন 'বত্রিশ ভাজা' করে পরিবেশন করেছে যেন এটাই ছিলো হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)- এর রাজনৈতিক জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেন মানুষকে হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণে প্ররোচিত করাই ছিলো তাঁর গোটা জীবনের মিশন। কিন্তু ধৈর্য ও সহনশীলতার হাজারো চমকপ্রদ ঘটনায় ভরপুর হযরত মু'আবিয়ার জীবন ও চরিত্রে এ ধরনের নীচতার একটা মাত্র নজির কি আল্লাহর কোন বান্দা পেশ করতে পারে?

৫. হয়ত প্রশ্ন হবে; আবু মুহান্নাফের অন্যান্য বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারলে এ বর্ণনাটাই বা কি দোষ করলো? এ প্রশ্নের জবাবে পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলবো; শিয়াপন্থী আবু মুহান্নাফ যেহেতু হাজার বিন আদীর সমর্থক, সেহেতু বিচার ও যুক্তি এবং ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দাবী এই যে, হাজার বিন আদীর প্রতিকূলে তার যে কোন বর্ণনা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে। কেননা তাতে বোঝা যায় যে, এ ঘটনাগুলো এমন জ্বলন্ত সত্য ছিলো যে, মিথ্যার জগতে শৈল্পিক নৈপুণ্যের অধিকারী আবু মুহান্নাফের পক্ষেও তা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। বুকে পাথর রেখে হলেও সেগুলো তাকে বর্ণনা করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সাধু

পুরুষটির এমন কোন বর্ণনা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না যা হযরত মু'আবিয়ার মহান ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করে। কেননা এক্ষেত্রে সে বিদ্বেষ-তাড়িত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেবে এটাই তো স্বাভাবিক।

যেমন ধরুন খৃস্টান লেখক গবেষকদের লেখায় খৃস্টধর্মের কোন দুর্বলতা কিংবা ইসলামের কোন সৌন্দর্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেলে অবলীলাক্রমে তা আমরা প্রমাণরূপে পেশ করতে পারি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে কোন আপত্তিকর তথ্য পরিবেশিত হলে অবশ্যই তা আমরা বিচার, যুক্তি ও প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখবো এবং বিদ্বেষপ্রসূত মন্তব্য হলে তা প্রত্যাখ্যানও করবো। এটা মোটেই সুবিধাবাদ নয়; বরং সমালোচনাবিজ্ঞানের স্বীকৃত মূলনীতিরই যথার্থ অনুসরণ।

মাওলানা মওদূদী সাহেব হাজার বিন আদী প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন হযরত হাসান বসরীর নামযুক্ত একটি মন্তব্য দিয়ে—

'মু'আবিয়ার চারটি অপকর্ম এমনই ঘৃণ্য যে এর যে কোন একটি একজন মানুষের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। সেগুলো হলো-উম্মাহর বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন, পরামর্শ ছাড়া ক্ষমতা হস্তগতকরণ, যিয়াদকে পরিবারভুক্তকরণ এবং হাজার ও তাঁর অনুগামীদের নিধন।' (পৃঃ ১৬৫-৬৬)

এখানেও মাওলানা সাহেব তার স্বভাব-দোষের শিকার হয়েছেন। আলোচ্য মন্তব্যের শেষ বাক্যটা কী মনে করে যেন তিনি ছেঁটে ফেলেছেন। অথচ আমাদের মতে হযরত হাসান বসরীর নামযুক্ত এ মন্তব্যের স্বরূপ ফাঁস করে দেয়ার জন্য এই শেষ বাক্যটাই যথেষ্ট, আর তা হলো—

ويلا له من حجر واصحاب حجر، ويلا له من حجر واصحاب حجر -

'হাজার ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি জুলুমের কারণে সে নিপাত যাক। আবার বলছি, সে নিপাত যাক।'

এ শব্দ ক'টি লিখতে গিয়ে আমাদের কলম বারবার কেঁপে উঠছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ মাফ করুন; গোটা বিষয়টির স্বরূপ তুলে ধরার জন্য বুকে পাথর রেখে এ অপরাধটুকু আমাদের করতে হলো। হযরত হাসান বসরীর মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যারা জানেন এবং জানেন ছাহাবা-অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ও অবস্থানের কথা, তারা কি তাঁর পবিত্র মুখে এ ধরনের জঘন্য উক্তি মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারেন ?

বলাবাহুল্য যে, এ গল্পটা 'সাধু পুরুষ' আবু মুহান্নাফের মগজ থেকে নির্গত। (দেখুন তাবারী) সুতরাং কোনক্রমেই এ জঘন্য অপবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ছাহাবা-অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরীর নীতি তো ছিলো এই—

وقد سئل الحسن البصرى عن قتالهم فقال : قتال شهده اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا ، وعلموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا . قال المحاسبى فنحن نقول كما قال الحسن ـ

হাসান বসরীকে ছাহাবা-অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ বিরোধের উভয় তরফে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণ হাজির ছিলেন, অথচ আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। (পরিবেশ, পরিস্থিতি ও কার্যকারণ সম্পর্কে) তাঁদের অবহিতি ছিলো; অথচ আমাদের তা নেই। যে ব্যাপারে তাঁরা সর্বসম্মত, সে ব্যাপারে আমরা তাঁদের অনুসরণ করি। আর যে ব্যাপারে তাঁর দ্বিধাবিভক্ত, সে ব্যাপারে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি।

হযরত মুহাসিবী বলেন, 'হযরত হাসান যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।'
(ইমাম কুরতবীকৃত আল-জামেউ লি আহকামিল কোরআন, খঃ ৬ পৃঃ ৩২২)

ভাবতে অবাক লাগে; এই হাসান বসরী সম্পর্কেই কিনা আজ আমাদের 'মু'আবিয়া নিপাত যাক' শ্লোগানটি বিশ্বাস করার হুকুম দেয়া হচ্ছে! আমরা কিন্তু 'জো-হুকুম জাহাপনা!' বলে তা মেনে নিতে পারলাম না।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও বাকস্বাধীনতা

গঠনমূলক সমালোচনা তথা বাকস্বাধীনতার প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিলো। এমনকি অসংযত সমালোচনার মুখেও তিনি কী অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতেন, ইতিহাসের পাতা থেকে তার হাজারটা দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরতে পারি। কিন্তু তাতে করে বইয়ের 'দেহস্ফীতি' ঘটবে মাত্র। সুতরাং এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করে ক্ষান্ত হবো।

১. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র এককালের ঘোর সমালোচক হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একবার তাঁর কাছে গেলেন। মিসওয়ার বলেন, 'প্রথমেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'আচ্ছা মিসওয়ার! তোমার সমালোচনা ও অভিযোগগুলো আমাকে খুলে বলো দেখি।'

আমি বললাম, 'সে কথা থাক। তার চেয়ে যে প্রয়োজনে এসেছি সে ব্যাপারে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করুন।'

মু'আবিয়া বললেন, 'না, অকপটে মনের সব কথা তুমি খুলে বলো।'

মিসওয়ার বলেন, 'তাঁর দোহাই পাড়া ভাব দেখে আমি আমার মনের সঞ্চিত সব ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। অগোচরে তাঁর যত সমালোচনা করেছি, একে একে সব বলে গেলাম, একটাও বাদ দিলাম না।'

সব শুনে হযরত মু'আবিয়া বললেন, 'দোষ-ক্রটি থেকে কে মুক্ত বলো! তোমারও কি এমন দোষ-ক্রটি নেই যা আল্লাহ মেহেরবান মাফ না করলে তুমি আটকে যেতে পারো?'

আমি আরয করলাম, 'তা তো অবশ্যই।'

হযরত মু'আবিয়া বললেন, 'তা হলে এ কথা কেন মনে করছো যে, আমার আল্লাহ তোমাকেই শুধু মাফ করবেন!

আল্লাহর কসম! শরীয়ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে উম্মাহর সংশোধন ও কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ পরিচালনার যে খিদমতে আমি নিয়োজিত

আছি, তা তোমার বলা দোষ বিচ্যুতির তুলনায় অনেক বেশী। আর আমার মেহেরবান আল্লাহ নেক আমল কবুল করেন এবং (তাওবার শর্তে) বদ আমল মাফ করে দেন। তদুপরি আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর মাঝে সংঘাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে আমি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।'

মিসওয়ার বলেন, 'তাঁর বক্তব্য সত্যি সত্যি আমাকে ভাবিয়ে তুললো এবং আমি লা-জবাব হয়ে গেলাম।'

তখন থেকে হযরত মিসওয়ার (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-র আলোচনা আসলেই তাঁর জন্য দু'আ ও কল্যাণ কামনা করতেন।[1]

২. আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন, এক অর্বাচীন হযরত মু'আবিয়ার মুখের উপর তাঁকে বিস্তর গালমন্দ করছিলো। আর তিনি অম্লান বদনে তা শুনে যাচ্ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, 'এখনো কি আপনি সংযমের পরিচয় দেবেন?'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, 'কারো অপরাধের মোকাবেলায় আমার সহনশীলতা পরাস্ত হয়ে গেলে আল্লাহর সামনে কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবো বলো?'

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৫)

৩. আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন, 'হযরত মু'আবিয়া একবার নিছক হাস্যচ্ছলে হযরত আদী বিন হাতিমকে বললেন, তুমি তো আলীর দলে ছিলে হে!'

হযরত আদী বিন হাতিম কিন্তু অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং হযরত মু'আবিয়ার চোখে চোখ রেখে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় বললেন—

'আল্লাহর কসম! যে হৃদয় তোমাকে ঘৃণা করতো, আমাদের সিনায় এখনো তা স্পন্দিত হচ্ছে। আর যে তলোয়ার তোমার খুন পিয়াসী ছিলো, তা এখনও আমাদের কাঁধে ঝুলছে। বিশ্বাস ভঙ্গের দিকে তুমি এক কদম এগুলে লড়াইয়ের দিকে আমরা দু' কদম এগিয়ে যাবো। আর এ কথা মনে রাখলে ভালো করবে যে, হযরত আলীর নিন্দা-যন্ত্রণার তুলনায় মৃত্যু-যন্ত্রণা আমাদের কাছে অনেক বেশী সহনীয়। তদুপরি কর্তিত কণ্ঠনালীর গড় গড় আওয়াজ আমাদের কাছে আয়েশী জীবনের সুর মূর্ছনার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়।'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তখন মজলিসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'প্রতিটি বর্ণ ইনি সত্য বলেছেন। একথাগুলো তোমরা লিখে রাখো।' (ইবনে খালদুন খঃ ৩ পৃঃ ৭)

১. এই ঘটনাটি হাফেজ ইবনে কাছীর 'মুসান্নাফে আবদুল রাজ্জাক'-এর বরাত দিয়ে দু'টি সূত্রে উল্লেখ করেছেন। দেখুন; আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৪।

৪. প্রশাসক যিয়াদের নামে এক চিঠিতে হযরত মু'আবিয়া লিখেছেন—

'সব সময় এক ধরনের আচরণ কিন্তু সঙ্গত নয়। মাথায় চড়ে বসার মত কোমলতা যেমন অনুচিত তেমনি ঘাবড়ে দেয়ার মত কঠোরতাও অসমীচীন। তার চেয়ে বরং কঠোরতার দিকটা তুমি সামাল দাও, আর দয়া ও সহানুভূতির দিকটি আমি। যেন কেউ ভীত সন্ত্রস্ত হলে অন্তত একটা আশ্রয়স্থল পেয়ে যায়।'

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৩৬)

৫. আল্লামা ইবনুল আছীর বলেন, 'আব্দুর রহমান ইবনুল হাকাম ছিলো নামকরা শায়ের। আর শায়ের-কবিদের পেশাই হলো পাঁচমুখে আমীর ওমরাদের গুণকীর্তন। তাই তিনি আব্দুর রহমানকে উপদেশ দিয়ে বললেন, দেখো: প্রশংসা-স্তুতি পরিহার করে চলবে। কেননা, আদতে এটা নির্লজ্জদের খোরাক।'

(ইবনুল আছীর খঃ ৪ পৃঃ ৫)

৬. তাবরানী ও ইবনে আসাকির বলেন, 'একবার জুমু'আর খোতবায় কোন হাদীছ বয়ান করতে গিয়ে হযরত মু'আবিয়ার ভুল হলো, আর অমনি হযরত উবাদাহ বিন সাবিত (রাঃ) খোতবার মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার মা 'হিন্দা'ও তোমার চেয়ে ভালো জানতো।'

নামাজের পর হযরত উবাদাহকে একান্তে ডেকে তিনি এ ধরনের অশোভন আচরণের জন্য তিরস্কার করলেন, এবং অনুসন্ধানের পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আছরের সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'জুমু'আর খোতবায় তোমাদেরকে আমি একটি হাদীছ বলেছিলাম। অনুসন্ধানের পর দেখা গেলো যে, এ ব্যাপারে উবাদাহর মতামতই সঠিক। সুতরাং এখন থেকে তাঁর কাছেই তোমরা শিখবে। কেননা তিনি আমার চেয়ে বড় ফকীহ।

(ইবনে আসাকির খঃ ৭ পৃঃ ২১০-১১)

'বিবেকের টুটি চেপে ধরার' কী চমৎকার নমুনা! আধুনিক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন ভুল করেই হয়ত বলেছেন—

واخباره فى الحلم كثيرة -

তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার ঘটনা অ-নে-ক।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর আলোকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকালের একটি 'আলোকচিত্র' আমরা তুলে ধরেছি। মাওলানা মওদূদীও তাঁর কলমের আঁচড়ে সে আমলের একটা 'মসিচিত্র' এঁকেছেন। তাঁর ভাষায়—

'মুখে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। বিবেকের টুটি চেপে ধরা হলো। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, প্রশংসার জন্যই শুধু মুখ খোলবে। নইলে স্রেফ চুপ মেরে থাকবে। তোমার বেয়াড়া বিবেক যদি হক কথা বলার জন্য একান্তই উতলা হয়ে ওঠে তাহলে অন্ধকার কারাগারে চাবুকের নির্মম আঘাতের জন্য তোমাকে তৈরী হতে হবে। (পৃঃ ১৬৩-৬৪)

এ ঢালাও চিত্রাংকনের একটি মাত্র প্রমাণ হলো হাজার বিন আদীর ঘটনা, যার বিস্তারিত সুরতেহাল এই মাত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। সুতরাং বিচার ও 'পুরস্কার' হাশরের মাঠের জন্য তোলা রইল।

অষ্টম অভিযোগ

ইয়াযিদের মনোনয়ন

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে আরেকটি মারাত্মক অভিযোগ হলো পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দান। অতীতের শত্রুরা হযরত মু'আবিয়ার সমালোচনায় বরাবর এটিকে ব্যবহার করে এসেছে। এযুগের মাওলানা মওদূদী সাহেবও তা হাতছাড়া করেন নি, তবে তাতে তিনি নতুন মাত্রা যোগ করে বলেছেন, মু'আবিয়া (রাঃ)-র এ পদক্ষেপ ছিল স্বার্থতাড়িত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর ভাষায়—

'মনোনয়ন দানের প্রাথমিক চিন্তাভাবনার পিছনে কোন সৎ অনুভূতি বা উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং এক 'বুজুর্গ'[১] তার ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের মতলবে আরেক 'বুজুর্গের'[২] (!) ব্যক্তিস্বার্থ উস্‌কে দিয়ে এ প্রস্তাবের জন্ম দিয়েছেন। অথচ দুই 'ভদ্রলোকের' একজনও ভেবে দেখলেন না যে, এভাবে গোটা উম্মাহকে কোন রসাতলে তারা ঠেলে দিচ্ছেন।' (পৃঃ ১৫০)[৩]

তারপর মাওলানা সাহেব ইবনুল আছীর প্রমুখের বরাত টেনে দাবী করেছেন যে, ইয়াযিদের অনুকূলে বাই'আত নিতে গিয়ে হযরত মু'আবিয়া 'ঘুষ ও ঘুষির' সেই চিরাচরিত পন্থারই আশ্রয় নিয়েছেন এবং অবলীলাক্রমে ঘুষের স্থলে ঘুষ ও ঘুষির স্থলে ঘুষি চালিয়েছেন।

আলোচনার শুরুতেই আমরা বলে নিতে চাই যে, এখানে প্রশ্ন দু'টি।

প্রথম প্রশ্ন ঃ যুক্তি ও পরিণতির বিচারে ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিলো কি নির্ভুল ছিলো।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কি শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণ বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, না পুত্রমোহ ও ব্যক্তিস্বার্থই ছিলো তাঁর এ সিদ্ধান্তের চালিকাশক্তি?

---

১ হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ)

২. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

৩. আল্লাহ মাফ করুন, নবীর ছাহাবীর শানে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করাকেই মাওলানা সাহেব পছন্দ করেছেন। তিনি কি মনে করেন যে, তার দুই কাঁধে ফেরেশতা নেই!

প্রথম প্রশ্নে মাওলানা সাহেবের সাথে আমাদের তেমন দ্বিমত নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত স্বীকার করে যে, যুক্তির বিচারে এবং পরবর্তী পরিণতির আলোকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র পদক্ষেপ নির্ভুল ও কল্যাণকর প্রমাণিত হয় নি, বরং উম্মাহর সামগ্রিক স্বার্থ তাতে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই যে, মাওলানার অসংযত কলম নবীর এই প্রিয়ছাহাবীর নিয়তের উপরও নির্দয় হামলা চালিয়েছে। তাঁর মতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র এ পদক্ষেপ যেমন ভুল ছিলো, তেমনি ছিলো ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রসূত। এককথায় পুত্রের প্রতি অন্ধমোহ ও ব্যক্তিস্বর্থের বেদীতে গোটা উম্মাহকে তিনি বলি দিয়ে গেছেন।

আর এখানেই 'ভদ্রলোকের' সাথে আমাদের দ্বিমত। পরিষ্কার ভাষায় তাঁকে আমরা বলে দিতে চাই যে, যুক্তি ও পরিণতির বিচারে হযরত মু'আবিয়ার এ পদক্ষেপকে ভুল ও ক্ষতিকর বলার সুযোগ থাকলেও তাঁর নিয়তের উপর হামলা করার অধিকার কোন 'হালাল সন্তানের' নেই। সুতরাং আমাদের আগামী আলোচনার উদ্দেশ্য ইয়াযিদের মনোনয়নকে নির্ভুল ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করা নয়; বরং এ কথা প্রমাণ করা যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) যা করেছেন, আন্তরিকতার সাথে উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করেই করেছেন এবং শরীয়তের গণ্ডিতে থেকেই করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থতা ছিলো সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে।

আরেকটা কথা, আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং তার পরিণতি বিচার করে, আর হযরত মু'আবিয়াকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো বর্তমান পরিস্থিতি চিন্তা করে, পরবর্তী ঘটনা ও পরিণতি কিন্তু তাঁর সামনে ছিলো না।

বস্তুতঃ ইয়াযিদপ্রসঙ্গ আজ অত্যন্ত নাযুক রূপ ধারণ করেছে। বল্গাহীন বির্তকের স্রোতে গা ভাসিয়ে উভয় পক্ষ সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রান্তসীমায় এসে উপনীত হয়েছে। ইয়াযিদকে নগ্ন পাপাচারী আখ্যা দিয়ে এক পক্ষ যেমন হযরত মুগীরা ও হযরত মু'আবিয়ার চরিত্রহননে মেতে উঠেছে, অপর পক্ষ তেমনি ইয়াযিদকে ফিরিশতার আসনে বসিয়ে সমালোচনার সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরেছে ইমাম হোসায়নের প্রতি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও পন্থা থেকে উভয় পক্ষই সরে গেছে দূরে, বহুদূরে।

এ ধরনের অমার্জনীয় বাড়াবাড়ির কারণ এই যে, ছাহাবাদের মাতনৈক্য ও অন্তর্বিরোধকে তারা এ যুগের রাজনৈতিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরিখেই বিচার করে থাকে। আর স্বার্থান্ধতার এ যুগে যেহেতু বিবাদমান দু'টি রাজনৈতিক দলকে একযোগে নিঃস্বার্থ, আন্তরিক ও দেশপ্রেমিক কল্পনা করা সম্ভব নয়,

সেহেতু সহজেই যে কোন এক পক্ষকে তারা হকপন্থী বলে ধরে নেয় এবং এ সিদ্ধান্ত মনে বদ্ধমূল রেখে তার অনুকূলে দলিল প্রমাণের খোঁজে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সেই সঙ্গে অপর পক্ষের নীতি ও অবস্থান বোঝার সামান্যতম চেষ্টা না করেই শুরু করে লাগামহীন সমালোচনার বেপরোয়া তীর বর্ষণ।

তাই উভয় পক্ষকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মসজিদে মসজিদে জুমু'আর খোতবায় উচ্চারিত আল্লাহর রাসূলের সেই চিরন্তন সর্তকবাণী—

الله الله فى اصحابى، لاتتخذوهم غرضا من بعدى

'আমার ছাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহকে ভয় করো! আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সর্তকবাণীর দোহাই দিয়ে উভয় পক্ষের কাছে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো আবেদন, ছাহাবায়ে কেরামের আজীবন জিহাদ ও সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও কোরবানীর কথা বিবেচনা করে এবং পরবর্তীদের প্রতি তাদের অসংখ্য ইহসান-অবদানের কথা স্মরণ করে শান্ত মস্তিষ্কে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের নীতি, পদক্ষেপ ও অবস্থান উপলব্ধির চেষ্টা করুন এবং হৃদয়াকাশ থেকে অশোভন ধারণা ও অশ্রদ্ধার জমাট বাঁধা কালো মেঘ দূর করে আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করুন।

আসুন: এবার আমরা তিনটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে রেখে আলোচনায় অগ্রসর হই। প্রশ্ন তিনটি হলো-

১. ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের মনোনয়নের মূল্য কতটুকু ?

২. ইয়াযিদের মধ্যে খিলাফতের যোগ্যতা ছিলো কি না ?

৩. ইয়াযিদের অনুকূলে বাই'আত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণসম্পর্কিত গল্পগুলোর স্বরূপ কি?

শরীয়তের দৃষ্টিতে পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন

ইসলামী উম্মাহ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, বর্তমান খলীফা নিঃস্বার্থ দৃষ্টিতে কাউকে খিলাফতের যোগ্য মনে করলে তাকে মনোনয়ন দিয়ে যেতে পারেন। এমনকি পিতৃত্ব বা অন্য কোন রক্তসম্পর্কের কারণেও মনোনয়ন দানের বৈধতার কোন রদবদল হবে না। দু'একজন আলিম অবশ্য পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে এ শর্তারোপ করেছেন যে, বর্তমান খলীফাকে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করে নিতে হবে এবং তাদের সমর্থন সাপেক্ষেই শুধু তিনি মনোনয়ন দানের অধিকার লাভ করবেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) প্রমুখের মতে উপরোক্ত মনোনয়ন গোটা উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক হলেও গরিষ্ঠসংখ্যক উলামার মতে বর্তমান খলীফার পক্ষ থেকে এটা নিছক প্রস্তাব মাত্র। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর সর্বোতভাবে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুমোদনের উপর তা নির্ভরশীল। পারস্পরিক মত বিনিময়ের পর কল্যাণজনক মনে করলে বিগত খলীফার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন; আবার প্রয়োজনবোধে তা প্রত্যাখ্যান করে নতুন খলীফা মনোনীত করতে পারেন। চতুর্থ শতকের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রনীতিবিদ আবু ইয়া'লা আল ফাররা লিখেছেন—

'বর্তমান খলীফা ভালো মনে করলে কারো পরামর্শ গ্রহণ ছাড়াই পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন দিয়ে যেতে পারেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। আর হযরত ওমর (রাঃ) ছয় ছাহাবার হাতে সে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। অথচ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি তাঁরা জরুরী মনে করেন নি। এর যুক্তি এই যে, মনোনয়ন দানের অর্থ খলীফা নিয়োগ করা নয়; সুতরাং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিও জরুরী নয়। তবে মনোনয়নদাতা খলীফার ওয়াফাতের পর তাদের উপস্থিতি (তথা অনুমোদন) অপরিহার্য।'

তিনি আরো লিখেছেন—

'যোগ্যতার শর্তে বর্তমান খলীফা তাঁর পিতা বা পুত্রকেও মনোনয়ন দিতে পারেন। কেননা মনোনয়ন দানের অর্থ খিলাফতের পদে বরণ করা নয়, বরং মুসলমানদের বরণের মাধ্যমেই তিনি বরিত হন। আর তখন সন্দেহেরও অবসান ঘটে যায়।' (আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃঃ ৯)

মোটকথা, উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান খলীফা একক সিদ্ধান্তে যে কাউকে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দিতে পারেন। অবশ্য সেটা নিছক প্রস্তাবের মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং পরবর্তীতে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের তা অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ অধিকার থাকবে। বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের যেহেতু এটা উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়, সেহেতু সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে মনোনয়ন দানের আগে ও পরে আহলে শুরার মতামত গ্রহণ করেছিলেন এবং 'সকলে একমত' এ কথা নিশ্চিত হওয়ার পরই শুধু তিনি তার সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে ঘোষণা করেছিলেন।[১] তদুপরি তাঁর ওয়াফাতের পর গোটা উম্মাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলো।

উপরের আলোচনা থেকে দু'টি সুনির্দিষ্ট বিধান আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

প্রথমতঃ নিস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খলীফা তাঁর পুত্রকে খিলাফতের যোগ্য মনে করলে পরবর্তী খলীফারূপে তাকে মনোনয়ন দিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ পুত্রকে মনোনয়ন দানের বিষয়টি উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত শরীয়তী বিধানের আলোকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে—

১. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুত্র ইয়াযিদকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করে থাকলে তাঁর এ মনোনয়ন দান শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ ছিলো।

২. এ মনোনয়ন দান উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও অনুমোদনক্রমে হলে উম্মাহর জন্য তা বাধ্যতামূলক হয়ে যেতো।

৩. পক্ষান্তরে এটা একক সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে ব্যক্তি মু'আবিয়ার জন্য তা অবশ্যই বৈধ ছিলো; তবে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও অনুমোদন লাভের পূর্বে উম্মাহর জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিলো না।

---

১. তাবারী খঃ ২ পৃঃ ৬১৮

আসুন, এবার নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে দেখি: হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কি যোগ্যতার বিচারেই ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন, না নিছক পুত্রত্বের সুবাদে?

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র চোখে ইয়াযিদ

ইতিহাস বলে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, পুত্র ইয়াযিদ খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় শর্ত ও যোগ্যতার পূর্ণ অধিকারী। এবং এ বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েই ইয়াযিদকে তিনি মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কেননা—

১. হযরত উসমান-তনয় সাঈদের অনুযোগের উত্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! তোমার এ দাবী যথার্থ যে, তোমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহর নিকটতর ছিলেন। আর তোমার মাও ইয়াযিদের মায়ের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু ইয়াযিদ সম্পর্কে আমাকে বলতেই হবে যে, গোটা ভূখণ্ড তোমার মত লোকে ভরে গেলেও ইয়াযিদের যোগ্যতার পাল্লা ভারী হবে।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র এ মন্তব্য পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, রক্ত-সম্পর্ক নয়, যোগ্যতাই ছিলো ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের মাপকাঠি।

২. এক খোতবায় আস্‌মানের দিকে তাকিয়ে তিনি দু'আ করেছিলেন—'হে আল্লাহ! খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করেই যদি তাকে মনোনয়ন দিয়ে থাকি তাহলে তার অনুকূলে আমার এ সিদ্ধান্তকে তুমি পূর্ণতা দান করো। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি পিতার মোহই যদি হয় এর কারণ, তাহলে তুমি তা ব্যর্থ করে দাও।'

৩. অন্য এক খোতবায় তিনি বলেছিলেন—

'হে আল্লাহ! ইয়াযিদকে যদি তার যোগ্যতার কারণেই মনোনীত করে থাকি, তাহলে সে মর্যাদায় তাকে উন্নীত করো এবং তাকে মদদ করো। আর যদি পুত্রের প্রতি পিতার সহজাত ভালোবাসাই এ কাজে আমাকে প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে আগে ভাগেই তাকে তুমি তুলে নাও।' (যাহাবীকৃত তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম খঃ ২ পৃঃ ২৬৭, সুয়ূতীকৃত তারীখুল খুলাফা পৃঃ ১৪৯)

ভেবে দেখুন; যে বাবার মনে 'চোর' লুকিয়ে আছে, তিনি কি জুমু'আর দিনে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে দু'আ কবুলের নাযুকতম মুহূর্তে পুত্রের নামে এরূপ কঠিন দু'আ কখনো করতে পারেন?

ইতিহাসের পাতায় এ আবেগাপ্লুত মুনাজাত দেখার পরও যদি কেউ এ মহান ছাহাবীর শিশির-শুভ্র চরিত্রে কালি ছিটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহলে বলতেই হবে যে, সিমারের মত কঠিন দিল-গুর্দা তার আছে বটে। শরীয়ত যেখানে জীবিতকালে কারো নিয়তের উপর হামলা করার অনুমতি দেয় নি, সেখানে সুদীর্ঘ তেরশ বছর পর এক ছাহাবীর নিয়তের উপর হামলা করার অধিকার আমরা কোত্থেকে পেয়ে গেলাম?

ইয়াযিদের যে ঘৃণ্য চিত্র সাধারণতঃ আমাদের সবার চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার বুনিয়াদ হলো কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা। বস্তুতঃ রাসূল-দৌহিত্রের মর্মান্তিক শাহাদাতের সাথে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও যে নরাধম জড়িত, ইসলামী খিলাফতের পবিত্র আসনে মুহূর্তের জন্যও তাকে কল্পনা করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইয়াযিদকে যখন মনোনয়ন দেয়া হচ্ছিলো, তখন কিন্তু কারবালা-ট্রাজেডির অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি পরবর্তীকালের দোষ-ত্রুটিগুলোও ইয়াযিদ-চরিত্রে তখন বিদ্যমান ছিলো না। তখন তো সে আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় পুত্র ও ছাহাবীজাদা হিসাবে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলো এবং তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রান্তি, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমর নৈপুণ্যের বিচারে তাকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার যথেষ্ট অবকাশও ছিলো। তদুপরি ইয়াযিদের এ যোগ্যতা শুধু যে পিতা মু'আবিয়া (রা)-র চোখেই ধরা পড়েছিলো তা নয়। বহু নেতৃস্থানীয় ছাহাবা ও তাবেয়ীনও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা বালাযারী, মাদাইনীর সূত্রে ইমামুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেন—

'পানাহারের এক মজলিসে হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে করুণা করো, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি উত্তম ছিলেন না বটে, তবে পরবর্তীরাও তাঁর তুলনায় উত্তম হবে না। ইয়াযিদ অবশ্যই তাঁর খান্দানের যোগ্য উত্তরসূরী। সুতরাং তোমরা স্ব স্ব স্থানে থেকে তাকে আনুগত্য ও বাইআত দান করো।

হযরত আলীর পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন।

'হাররাহ'র গোলযোগকালে আব্দুল্লাহ বিন মুতী' মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে জানালেন যে, ইয়াযিদ তো মদ্যপ, বেনামাযী এবং কোরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধচরণকারী। উত্তরে হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বললেন—

'কিছুদিন আমি তার সংস্পর্শে ছিলাম, তখন তো তাকে নামাযের অনুবর্তী এবং কোরআন-সুন্নাহর অনুগত দেখেছি। এমনকি ফিকাহশাস্ত্র নিয়েও তাকে আলোচনা করতে দেখেছি।'

আব্দুল্লাহ বিন মুতী' বললেন, 'সম্ভবতঃ আপনার সামনে সে কৃত্রিম আচরণ করেছে।' হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বললেন, 'কিন্তু কিসের ভয়ে কিংবা প্রত্যাশায় সে তা করবে? আর সে কি নিজে এ গোপন কথা তোমাকে বলেছে? তাহলে তো তুমি তার দোসর, আর না বলে থাকলে তো তুমি না জেনে সাক্ষী দেয়ার অপরাধ করলে।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি নিজে দেখি নি বটে, তবে সত্য বলেই মনে হয়।' হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বললেন, 'আল্লাহ কিন্তু সাক্ষীদের এ ধরনের কথা বলার অনুমতি দেন নি। কেননা কোরআনের ইরশাদ হলো—

الا من شهد بالحق وهم يعلمون

অর্থাৎ তবে নিশ্চিতরূপে যারা সত্য সাক্ষ্য দান করে।

সুতরাং তোমার ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।'

আব্দুল্লা বিন মুতী' বললেন, 'সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে (ইয়াযিদ বিরোধী অভ্যুত্থানে) অন্য কারো নেতৃত্ব আপনার পছন্দ নয়। আচ্ছা আসুন, আপনাকেই আমরা নেতৃপদে বরণ করি।' হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া চূড়ান্ত জবাব দিয়ে বললেন, 'অধীনস্থ বা অধিনায়ক কোন অবস্থান থেকেই আমি রক্তপাত পছন্দ করি না।' (আল বিদায়াহ খঃ ৮ পৃঃ ২২৩)

মোটকথা: অন্তত বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াযিদের চরিত্র ও নৈতিকতা এমন সম্মানজনক পর্যায়ে ছিলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত বিশিষ্ট ছাহাবীও ইয়াযিদের খিলাফতের অনুকূলে মত পোষণ করতেন। এমন কি অন্যদেরও তিনি তার বাই'আত গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে সমাজ ও পরিবেশের বিচারে তাকে খিলাফতের অনুপযুক্ত বিবেচনা করারও অবকাশ ছিলো। কেননা সেটা ছিলো ছাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ। গোটা পরিবেশ ছিলো কল্যাণ ও পবিত্রতা এবং পূণ্য ও সততার নূরে নূরান্বিত।

ইমাম হোসায়ন, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর মত মহান ব্যক্তিগণ তখনো ছিলেন বর্তমান। ধার্মিকতার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ইয়াযিদের বহু ঊর্ধ্বে ছিলো তাঁদের অবস্থান। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাহাবা ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ছাহাবাদের জামা'আতে তৃতীয় একটি মতও বিদ্যমান ছিলো। ইয়াযিদকে তাঁরা যোগ্যতম ভাবতেন না বটে, তবে সর্বনাশা বিভেদ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য খিলাফতের পদে তাকে বরদাশ্ত করে নিতে তাঁরা রাজী ছিলেন।

ছাহাবী হযরত বসীরের (রাঃ) খিদমতে ইয়াযিদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'সবাই বলে ইয়াযিদ উম্মাহর যোগ্যতম ব্যক্তি নয়। আমিও তাই বলি। তবে পুনরায় উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে সে অধিক সহনীয়।'

মোটকথা; ইয়াযিদের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে ছাহাবা কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, তা ছিলো সর্বাংশে ইজতিহাদনির্ভর। সুতরাং সকল ছাহাবার ব্যাপারেই আমাদের 'আচরণ ও উচ্চারণ' সংযত হতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আন্তরিকভাবেই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযিদকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর ধারণায় উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণও এতে নিহিত ছিলো। ছাহাবা কেরামের এক বিরাট অংশ নিঃস্বার্থ আন্তরিকতার সাথে তাঁর এ পদক্ষেপ সমর্থনও করেছিলেন। পক্ষান্তরে যে পাঁচজন বিশিষ্ট ছাহাবা প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মনেও ব্যক্তিআক্রোশ কিংবা ক্ষমতার মোহ ছিলো না। আন্তরিকভাবেই ইয়াযিদকে তাঁরা অযোগ্য মনে করতেন। তাই খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার মহান দ্বীনী দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রকাশ্য বিরোধিতায়। এ মহান দায়িত্ববোধ এমনকি মুহূর্তের জন্যও তাঁদেরকে নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে দেখার ফুরসত দেয় নি।

আবার বলছি— হযরত মুগীরা ও মু'আবিয়া (রাঃ)-র সিদ্ধান্ত নির্ভুল ও যথার্থ ছিলো এটা আমাদের দাবী নয়। আমরা শুধু বলতে চাই, দুই ছাহাবার এ সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ফসল নয়। তাঁরা যা করেছেন, উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ ও ঐক্য রক্ষার তাগিদেই করেছেন এবং শরীয়তের সীমারেখার ভিতরে থেকেই করেছেন। তবে যুক্তি ও পরিণতি বলে, যাঁরা মনোনয়নের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিলো নির্ভুল ও বাস্তবানুগ এবং এতেই নিহিত ছিলো উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ। কেননা—

১. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও পরবর্তী শাসকগণ তাঁর এ সিদ্ধান্তের নজীর টেনে অন্যায় স্বার্থ হাসিল করেছে এবং শুরাভিত্তিক কল্যাণময় ইসলামী খিলাফতব্যবস্থাকে দাফন করে উত্তরাধিকার-ভিত্তিক রাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে।

২. হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র জীবদ্দশায় যেহেতু ইয়াযিদের বিরুদ্ধে পাপাচার ও অধার্মিকতার সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছিলো না, অন্যদিকে তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমরনৈপুণ্য ছিলো প্রশ্নাতীত; সেহেতু তাকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার অবকাশ অবশ্যই ছিলো। কিন্তু এমন বহু ছাহাবা তখনও বেঁচে ছিলেন, যাঁরা প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিচারেও ইয়াযিদের তুলনায় শত গুণে উত্তম ছিলেন। খিলাফতের পবিত্র আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করা হলে নিঃসন্দেহে ইয়াযিদের তুলনায় অনেক বেশী যোগ্যতার প্রমাণ তাঁরা দিতে পারতেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, যোগ্যতরের বর্তমানে যোগ্যকে খলীফা মনোনীত করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে।[১] তবু উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তির হাতেই খিলাফতের পবিত্র আমনত সোপর্দ হওয়া কল্যাণজনক।

৩. যোগ্যতার শর্তে পুত্রকে খলীফা মনোনীত করার বৈধতা সত্ত্বেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বিধায় তা পরিহার করে চলাই উত্তম। অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া এ পথে অগ্রসর হওয়ার মানে হলো নিজেকে কঠিন পরীক্ষার' মুখোমুখি করা। এ জন্যই খোলাফায়ে রাশেদীন সতর্কতার সাথে তা পরিহার করেছেন। বিশেষতঃ হযরত উমর ও হযরত আলী (রাঃ) সুযোগ্য পুত্রদের বেলায় অব্যাহত অনুরোধের মুখেও সে নীতিতে অটল ছিলেন। (তাবারী খঃ ৩ পৃঃ ২৯২, খঃ ৪ পৃঃ ১১২-১৩)

আল্লামা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী লিখেছেন যে, কোন নিকটাত্মীয়কে বিশেষতঃ পুত্রকে খলীফা মনোনীত না করে বিষয়টি শুরার হাতে ছেড়ে দেয়াই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য উত্তম ছিলো। আগাম মনোনয়ন দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটা মেনে নিলেই তিনি ভালো করতেন। কিন্তু সে উত্তম কাজটি তাঁর করা হয়নি। (আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম পৃঃ ২২২)

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছির লিখেছেন—

---

১. মাওয়ারদীকৃত আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃঃ ৬, আবু ইয়া'লা আল ফাররাকৃত আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃঃ ৭, ইবনে আরাবীকৃত আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম পৃঃ ২১১, ইবনে হুমামকৃত আল মুসায়ারা, পৃঃ ১৩৬)

'শান্তিচুক্তিতে পরবর্তী খলীফা হিসাবে হযরত হাসানের নাম ছিলো। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে ইয়াযিদের প্রতি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ে। তাঁর ধারণায় খিলাফতের যোগ্যতাও তার ছিলো। এ মত তিনি পোষণ করতেন পিতার সহজাত ভালোবাসার কারণে এবং এ কারণেও যে, তিনি তার মাঝে আভিজাত্য, শাহজাদাসুলভ গুণাবলী, সমরনৈপুণ্য এবং শাসন ও রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা দেখতে পেয়েছিলেন, আর তাঁর ধারণায় ছাহাবাতনয়দের মাঝে অন্য কেউ এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিলেন না। এ জন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—'জনসাধারণকে আমি রাখালবিহীন বকরীপালের মত ছেড়ে যেতে চাই না।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৮০)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে লিখেছেন—

'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অন্তরে অন্যদের ডিঙ্গিয়ে ইয়াযিদকে খলীফা মনোনীত করার যে তাগাদা সৃষ্টি হয়েছিলো, তার কারণ ছিলো উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থ। কেননা বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইয়াযিদের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। স্বগোত্র ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে রাজী ছিলো না। আর উমাইয়ারাই ছিলো তখন কোরাইশের প্রধান শক্তি। তাছাড়া উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশ ছিলো তাদের অনুবর্তী। এসব দিক বিবেচনা করেই যোগ্যতরের পরিবর্তে যোগ্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র ন্যায়পরায়ণতা ও ছাহাবিত্ব এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে আমাদের বারণ করে।'

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁদের আচরণ ও উচ্চারণের এমন বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যা তাঁদের জীবনচরিত্র ও ছাহাবাসুলভ পবিত্রতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এমন কোন ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যা তাঁদের ছাহাবাসুলভ পবিত্রতার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। মাওলানা মওদূদী সাহেবও নীতিগতভাবে তা মেনে নিয়ে লিখেছেন—

'সাধারণভাবে সমস্ত বুজর্গানে দ্বীন এবং বিশেষভাবে ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে আমার মত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যুক্তির আলোকে কিংবা নির্ভরযোগ্য রিওয়াতের নিরিখে তাঁদের 'আচরণ ও উচ্চারণের' সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাই করা উচিত। এবং নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে তাঁদের কোন আচরণ কিংবা উচ্চারণকে ভ্রান্ত বলার দুঃসাহস দেখানো উচিত নয়।'

(পৃঃ ৩০৮)

বেয়াদবি না হলে মাওলানা হুজুরের খিদমতে উম্মী লোকদের আরয; নীতিটি আপনার ভারি সুন্দর; তবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বেলায় এসে তা এমন বেমালুম ভুলে না গেলে আরো সুন্দর হতো। বলুন তো; আল্লামা ইবনে খালদুনসহ উম্মাহর বরেণ্য আলেমগণ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আলোচ্য পদক্ষেপের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, সেটা 'নির্লজ্জ ওকালতি' হলো কোন যুক্তিতে? এমন কী 'অনন্যোপায় অবস্থা' দেখা দিয়েছিলো যে, আপনার বেপরোয়া কলম আল্লাহর রাসূলের এই মজলুম ছাহাবীকে আসামীর 'কাঠগড়ায়' হাজির না করে ক্ষান্তই হলো না?

হযরত মুগীরার ভূমিকা

ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের ভাবনা সর্বপ্রথম হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) পেশ করেছিলেন। তাই আল্লাহর রাসূলের এই ছাহাবীও মাওলানা মওদূদীর নির্দয় হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

'এ প্রস্তাবের উদ্ভাবক হলেন হযরত মুগীরা বিন শো'বা। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাকে কুফার প্রশাসক পদ থেকে বরখাস্তের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, আর তা আঁচ করতে পেরেই তিনি কুফা থেকে দামেস্কে ছুটে এলেন এবং ইয়াযিদের কানে মন্ত্র দিয়ে বললেন, প্রবীণ ছাহাবা এবং কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুনিয়া থেকে রোখসত হয়ে গেছেন। তবু আমিরুল মুমিনীন তোমার অনুকূলে বাই'আত নেয়ার ব্যাপারে কেন যে দ্বিধায় ভুগছেন, জানি না। ইয়াযিদ সে কথা 'আব্বা হুজুরের' কানে তুললো। আর তিনি হযরত মুগীরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ইয়াযিদকে এ সব বলার আসল মতলব কী?'

উত্তরে হযরত মুগীরা বললেন, 'উসমানের হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে কী ভয়ঙ্কর রক্তপাত ঘটে গেলো তা আমীরুল মুমিনীন নিজেই দেখেছেন; তাই আপনি বেঁচে থাকতে ইয়াযিদের অনুকূলে বাই'আত নিয়ে নেয়া আমি ভালো মনে করি, যেন পরে কোন অনৈক্য দেখা না দেয়।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, 'কিন্তু এ কাজের দায়িত্ব কে নেবে?' হযরত মুগীরা বললেন, 'কুফাকে সামাল দেবো আমি, আর বসরার জন্য রয়েছে যিয়াদ।'

পরে হযরত মুগীরা কুফায় গিয়ে ত্রিশ ব্যক্তিকে ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে রাজী করলেন।' (পৃঃ ১৪৮ -৪৯)

আলোচ্য ঘটনাটি মাওলানা মওদূদী মূলতঃ কামিল ইবনুল আছীর থেকে নিয়েছেন। সেই সাথে আল-বিদায়া ও ইবনে খালদুনের বরাত দিয়ে বলেছেন, ঘটনার কিছু কিছু অংশ সেখানেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল-বিদায়া কিংবা ইবনে খালদুনে হযরত মুগীরার উপর দোষ চাপানোর মত কোন কথাই

নেই। তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা ইবনে খালদুনের বক্তব্য শুনুন। আল-বিদায়াতে আল্লামা ইবনে কাছীরও প্রায় অভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন—

'আপন সনদে আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেন যে, স্বাস্থ্যগত কারণে হযরত মুগীরা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বরাবরে ইস্তিফানামা পেশ করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)ও তা মঞ্জুর করে তদস্থলে হযরত সাঈদ ইবনুল আ'ছকে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিলেন! হযরত মুগীরার বন্ধুরা তখন তাঁকে বললো, 'সম্ভবতঃ মু'আবিয়া আপনার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা সবুর করো।' তারপর ইয়াযিদের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'প্রবীণ ছাহাবা ও কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুনিয়া থেকে রোখসত হয়ে গেছেন....'

তাবারী, হাফেজ ইবনে কাছীর ও আল্লাম ইবনে খালদুনের বিবরণে এটা পরিষ্কার যে, হযরত মুগীরার ইস্তিফা ছিলো স্বেচ্ছায় ও স্বাস্থ্যগত কারণে। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁকে বরখাস্ত করেন নি। ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস গ্রন্থগুলোতে এর বেশী কোন তথ্য নেই। সুতরাং সঙ্গত কারণেই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, হযরত মুগীরা যদি উম্মাহর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার মত ক্ষমতাপাগলই হবেন, তাহলে গায়ে পড়ে ইস্তিফাই বা দিতে গেলেন কোন দুঃখে?

এ প্রশ্নের একটা জবাব দিয়েছেন সে যুগের আল্লামা ইবনুল আছীর এবং তা লুফে নিয়েছেন এ যুগের মাওলানা মওদূদী। তাদের মতে আসলে পদত্যাগের এ অভিনয় ছিলো নিজের মূল্যবৃদ্ধির একটা অপকৌশল মাত্র। বরখাস্তের বিষয় আঁচ করতে পেরে মনোনয়ন প্রস্তাবের আড়ালে থেকে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নেক নজর ফিরে পেতে চাইছিলেন। কিন্তু জানা কথা যে, পদে বহাল থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে হযরত মু'আবিয়া নির্ঘাত তাঁর মতলব ধরে ফেলবেন। সুতরাং নিজের আন্তরিকতা প্রমাণের স্বার্থেই পদত্যাগের ভণিতাটুকু তাঁকে করতে হয়েছিলো। দুইয়ে দুইয়ে চারের মত এটা তাঁর হিসাবের মধ্যেই ছিলো যে, মনোনয়ন প্রস্তাবের পর ক্ষমতা ফিরে পাওয়া হবে সময়ের প্রশ্ন মাত্র।

এ প্রশ্নের আরেকটা জবাব এই হতে পারে যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) স্বাস্থ্যগত কারণেই ইস্তিফা দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) যখন কিছু না বলে তা মঞ্জুর করে নিলেন, তখন মুগীরার বন্ধুমহল তাঁকে ধারণা দিলো যে, সম্ভবতঃ আপনার ইস্তিফার কারণে আমীরুল মুমেনীন ক্ষুব্ধ হয়েছেন; বহু দিনের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন অধীনস্থের আকস্মিক ইস্তিফায় যা হওয়া স্বাভাবিক। এ কথা শুনে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কাছে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, আমীরুল মুমিনীনের প্রতি বিরাগ কিংবা উম্মাহর কল্যাণ-অকল্যাণ

বিষয়ে নিস্পৃহতার কারণে নয়; বরং নিছক স্বাস্থ্যগত কারণেই আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করছি। নইলে উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায় এখনো আমি তৎপর। তাই উম্মাহকে বিভেদ ও রক্তপাত থেকে রক্ষার স্বার্থে খিলাফতের জন্য আমি ইয়াযিদের নাম প্রস্তাব করছি এবং এ কাজে আমার সেবার প্রয়োজন হলে ইস্তিফা সত্ত্বেও আমি প্রস্তুত রয়েছি।

ঐতিহাসিক তাবারী, ইবনে কাছীর ও ইবনে খালদুনের বিবরণে উভয় জবাবেরই সমান অবকাশ রয়েছে এবং কোনটিই সুস্পষ্ট নয়। বরং দ্বিতীয় জবাবের বিপক্ষে যেমন কিছু যৌক্তিক আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে, তেমনি পারে প্রথম জবাবের বিরুদ্ধেও। এমতাবস্থায় উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনার শূন্যতাগুলো অনুমানের উপর ভর করেই পূরণ করতে হবে।

সুতরাং পাঠকবর্গকেই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ইবনুল আছীর ও মওদূদী পরিবেশিত প্রথম ব্যাখ্যাটাই কি তারা গ্রহণ করবেন, যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের এক ছাহাবীর প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা? কিংবা তাদের মনঃপূত হবে, দ্বিতীয় ব্যাখাটি যা হযরত মুগীরার 'শানে ছাহাবিয়াতের' সাথে সর্বাংশে সঙ্গতিপূর্ণ?

আমাদের বিবেক কিন্তু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ছাহাবী তাঁর জীবন কোরবান করেছেন ইসলামের খিদমতে, যিনি শামিল ছিলেন বাই'আতে রিযওয়ানের[১] সৌভাগ্যবান কাফেলার প্রথম সারিতে।[২] ইয়ারমুকের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে চোখ হারিয়েও কুফরের বিরুদ্ধে যিনি লড়েছিলেন সিংহবিক্রমে।[৩] কাদেসিয়ার ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধকালে যার 'জাযবায়ে ঈমান' কাঁপিয়ে দিয়েছিলো পারশ্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের বুনিয়াদ।[৪] আল্লাহর রাসূলের মোবারক যবান থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন একশ ছত্রিশটি হাদীছ! সর্বোপরি জীবনের দীর্ঘ সময় যিনি লাভ করেছেন ক্ষমতার নরম-গরম অভিজ্ঞতা; সেই তিনি শুধু ক্ষমতার আয়ু আরেকটু দীর্ঘায়িত করার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও

---

১. যাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেছেন—

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ـ

সেই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই সন্তুষ্ট, যারা গাছের নীচে আপনার হাতে বাই'আত করেছে। (সূরা ফাতাহ্)

২. তাহযীবুত্তাহযীব খঃ ১০ পৃঃ ২৬২, ইবনে সা'আদ খঃ ৬ পৃ ২০

৩. আল-বিদায়া খঃ ৭ পৃঃ ৩৯

৪. আল-বিদায়া খঃ ৭ পৃঃ ৩৯

ঘুষ-দুর্নীতির মত জঘন্যতম অপরাধের পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন, ঈমান ও আখিরাতের সওদাবাজিতে মেতে ওঠবেন, এ অসম্ভব, এ অকল্পনীয়! সাগর শুকিয়ে গেছে, পাহাড় টলে গেছে, আসমান ভেঙ্গে পড়েছে, বিশ্বাস করি; কিন্তু শানে ছাহাবিয়াতের শুভ্রললাটে কোন কলঙ্ককালিমা বিশ্বাস করি না।

মোটকথা, আলোচ্য ঘটনার দু'টি ব্যাখ্যাই আমরা আপনার সামনে তুলে ধরেছি। এবার আসুন, হযরত আলী (রাঃ)-র সমালোচনার জবাবে মাওলানা মওদূদী যে কথা বলেছেন, সে কথাটাই এখান আমরা বলি—

'এ সব গল্প বিশ্বাস করতে কারো মন যদি উতলা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আমরা ফেরাতে পারি না। ইতিহাসের পাতা অবশ্য এ ধরনের (কল্পিত) কাহিনীতে কলঙ্কিত হয়েছে। তবে এ কথাও তখন স্বীকার করতে হবে যে, (আল্লাহ না করুন) নবুওয়তের দাবী হলো নিছক মিথ্যার ডামাডোল। আল-কোরআন শুধু কাব্যিক বাগাড়ম্বর এবং ধার্মিকতার এ সুদীর্ঘ ইতিহাস স্রেফ নাট্যাভিনয়।

কারো সাথে অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই। ঘটনার উভয় চিত্র আমরা তুলে ধরলাম। এখন বিবেকবান মানুষের ভেবে দেখা উচিত; এ দু'য়ের কোন চিত্রটি কোরআনের বাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বাইত ও বিশিষ্ট ছাহাবাগণের পবিত্র জীবন-চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম চিত্রটিই যদি কারো মনে ধরে থাকে তো ধরুক, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখন ক্ষমতার উমেদারির বিষয়টি শুধু নয়, গোটা দ্বীন ও ঈমানের বিষয়টিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। (রাসাঈল ও মাসাঈল খঃ ১ পৃঃ ৭০-৭৬)

বাই'আত গ্রহণে অসুদপায় অবলম্বন

কয়েকটি ঐতিহাসিক বর্ণনার সূত্র ধরে মাওলানা মওদূদী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইয়াযিদের অনুকূলে বাই'আত গ্রহণে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ এনেছেন। সুতরাং সংক্ষেপে সেগুলোর হাল-হকীকতও প্রত্যক্ষ করুন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে বল প্রয়োগ, উৎকোচ প্রদান ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ—এই তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বল প্রয়োগের ঘটনাটি ইবনুল আছীরের আল-কামিল গ্রন্থেই শুধু বর্ণিত হয়েছে। সেটি উল্লেখ করে মওদূদী সাহেব লিখেছেন—

'বিরোধী ছাহাবাদের হুমকি দিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, মনে রেখো; আমার কথার প্রতিবাদে কারো মুখ থেকে একটি শব্দ যদি বের হয়, তাহলে দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণের আগেই ধড় থেকে মুণ্ডটি তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'

আমরা আগেই বলেছি, ইবনুল আছীর ছাড়া আর কেউ এ ঘটনা উল্লেখ করেন নি। তাও তিনি যথারীতি সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আছীরের প্রধান উৎস হলো তাবারী। সেখানেও এ অলিক কাহিনীর কোন পাত্তা নেই। পক্ষান্তরে কট্টর শিয়া ঐতিহাসিক আহমাদ আল ইয়াকুবী পর্যন্ত বল প্রয়োগের ঘটনা অস্বীকার করে লিখেছেন—

فتالف القوم ولم يكرههم على البيعة ـ

তিনি সকলের মনোরঞ্জনই করেছেন। বাই'আত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করেন নি। (তারীখুল ইয়াকুবী খঃ ২ পৃঃ ২২৯)

বলাবাহুল্য যে, একজন কট্টরপন্থী শিয়া ঐতিহাসিকের স্বীকারোক্তি উপেক্ষা করে ইবনুল আছীরের সনদবিহীন বর্ণনা গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। কিন্তু মাওলানা মওদূদী তাই করেছেন। এখন আমরা শুধু প্রতিবাদ করতে পারি, বিবাদ করতে পারি না। বিবাদ করার না আছে আমাদের সাধ, না আছে সাধ্য। সাধ নেই, কারণ অপচয় করার মত প্রচুর সময় আমাদের হাতে

নেই। সাধ্য নেই, কারণ আমাদের শক্ত সংগঠন নেই। আর এ যুগে সাংগঠনিক শক্তিই নাকি হক-বাতিলের দলীল!

প্রতারণার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক তাবারী। বর্ণনামতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযিদবিরোধী বিশিষ্ট ছাহাবাদের সাথে আলাদা আলাদা দেখা করে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্ণনাকারীর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাবারী বলেন—

رجل بنخلة

নাখলা অঞ্চলের এক লোক।

আল্লা মালুম, নাখলা অঞ্চলের এ লোক সাধু না শয়তান? মুনাফিক না মুসলমান? এমন জাতগোত্রহীন বর্ণনার সূত্র ধরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীকে প্রতারক আখ্যায়িত করা সমগোত্রীয় ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু 'অমুক অঞ্চলের এক লোক' মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলে সেদিকে ফিরেও তাকাতাম না; ছাহাবী তো বহু পরের কথা।

মাওলানা মওদূদীর ভাষায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সবচে' গুরুতর অভিযোগ হলো—

'হযরত মুগীরার পুত্র মুসার নেতৃত্বে দশ জনের এক প্রতিনিধিদল ইয়াযিদের মনোনয়নের দাবীতে দামেস্কে গেলো এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কাছে যাথারীতি সে দাবী উত্থাপন করলো। পরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মূসাকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকায় তোমার বাবা এদের ঈমান খরিদ করেছেন? মূসা বললেন, ত্রিশ হাজার। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, মাত্র! ঈমান বুঝি এদের কাছে খুব সস্তা?'

এ সনদহীন বর্ণনাও ইবনুল আছীরের আল-কামিল ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি, যে ইবনে কাছীর সম্পর্কে মাওলানা সাহেবের স্বীকারোক্তি হলো—

'ইতিহাস সংকলনে তিনি এতটাই নীতিনিষ্ঠ যে, কোন ঘটনা কখনো লুকোবার চেষ্টা করেন না।' (খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত পৃঃ ৩১৫)

সেই 'নীতিনিষ্ঠ' ইবনে কাছীর পর্যন্ত ত্রিশহাজারী গল্পের ধারে কাছেও যান নি। এ ধরনের সনদহীন কল্পিত কাহিনীর কাঁধে ভর করে কোন ছাহাবীর গায়ে ঘুষের থুথু ছিটানো জায়েজ হলে এক মু'আবিয়াই কেন, অন্যান্য ছাহাবা থেকে

শুরু করে নবী রাসূলদের চরিত্র পর্যন্ত কলঙ্কিত করা যেতে পারে। এবং খিলাফতে রাশেদারও এমন জঘন্য চিত্র আঁকা যেতে পারে যে, অমুসলিমদের কাছে লজ্জায় তখন মুখ লুকানোই দায় হবে। ইবনুল আছীরের ইতিহাস-গ্রন্থে তো হযরত দাউদ (আঃ) কর্তৃক সেনাপতির সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমসরোবরে ডুব দিয়ে জল খাওয়ার সরস কাহিনীও স্থান পেয়েছে।

আর হযরত আলী (রাঃ)-এর তো এমন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, ক্ষমতার অন্তহীন পিপাসায় ছটফটিয়েই বুঝি কেটেছে তাঁর সারাটা জীবন।[১] (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং সাধু সাবধান!

তবে সঙ্গত কারণেই এখানে প্রশ্ন হবে যে, তাহলে ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যাসত্য নির্ধারণ ও গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া কী হবে? সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

---

১. খঃ ২ পৃঃ ২৭

হযরত হোসায়ন (রাঃ)-এর ভূমিকা

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও এখানে আমরা হযরত হোসায়ন (রাঃ)-এর ভূমিকা ও অবস্থানের উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা জরুরী মনে করি। কেননা একদল লোক আবার বিপরীত মেরু থেকে মজলুম ইমাম হোসায়ন (রাঃ)-কে নির্দয় সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। তাদের মতে 'ক্ষমতালিপ্সু' হযরত হোসায়ন (রাঃ) বৈধ খলীফা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী।[১]

আগেই আমরা বলে এসেছি যে, উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের মতে মনোনয়নদান হচ্ছে প্রস্তাবনার সমার্থক মাত্র। সুতরাং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ওয়াফাতের পর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুমোদন ও মঞ্জুরি লাভের আগ পর্যন্ত ইয়াযিদের খিলাফতকে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না।

এদিকে ইমাম হোসায়ন (রাঃ) শুরু থেকেই ইয়াযিদকে খিলাফতের অযোগ্য মনে করতেন এবং এটা ছিলো দ্বীন ও ঈমানের আলোকে তাঁর স্বার্থমুক্ত ও আন্তরিক সিদ্ধান্ত। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ওয়াফাতের পর তিনি দেখলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরসহ হিজাজের প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইয়াযিদের খিলাফত স্বীকার করে নেন নি। অন্যদিকে ইরাক থেকে আসা আমন্ত্রণপত্রের স্তূপ এ কথাই প্রমাণ করছিলো যে, ইরাকও ইয়াযিদের খিলাফত মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।[২]

এমতাবস্থায় সিরিয়াবাসীদের একক আনুগত্য ও বাই'আত সমগ্র উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না। এর অর্থ, ইয়াযিদ নিছক শক্তি ও অস্ত্রবলে ইসলামী জাহানে তার অবৈধ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাচ্ছে, কিন্তু এখনো সে সফলকাম হয় নি এবং চেষ্টা করলে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ প্রতিরোধ জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ইমাম হোসায়নের দৃষ্টিতে ছিলো ফরয বা

১. জনাব মাহমুদ আব্বাসকৃত ইয়াযিদের খিলাফত ও মু'আবিয়া

২. তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ২৬২, আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৫১ ও ৫২, আল-ইয়াকুবী খঃ ২ পৃ ২৪২

অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব। সুতরাং ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে কুফার পথে ইমাম হোসায়নের অভিযাত্রা বিদ্রোহ ছিলো না; ছিলো খিলাফতের উপর জবর দখল প্রতিরোধের পবিত্র জিহাদ। ইমাম হোসায়নের সামনে পরিস্থিতির দৃশ্যপট যদি এই হতো যে, ইয়াযিদ গোটা ইসলামী জাহানের উপর জবর দখল প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত করে ফেলেছে, তাহলে ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক অপারগ অবস্থায় ইয়াযিদকে জবর দখলকারী সুলতান হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে হয়ত তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন। এ জন্যই যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কুফার লোকেরা তাঁর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং সেখানেও ইয়াযিদ তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে ফেলেছে, তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে ইমাম হোসায়ন তাঁর ইতিহাসখ্যাত তিন দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তার একটি দফা ছিলো এই—

اما ان اضع يدى فى يد يزيد -

অথবা আমি ইয়াযিদের হাতে হাত রেখে বাইআত করবো।[১]

কিন্তু পাষণ্ড সিমারের কুমন্ত্রণায় পড়ে নরাধম ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মজলুম ইমামকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের হুকুম দিলো। বলাবাহুল্য যে, অনুগামী ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়া নরাধমের এ অযৌক্তিক নির্দেশ মেনে নেয়া হযরত ইমামের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়াতেই হলো, আর কারবালার সেই মর্মন্তুদ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর হৃদয়মূলে বিষমাখা খঞ্জরের মত চিরদিনের জন্য বিঁধে রইলো।

(ইয়াযিদের এ অপরাধ অবশ্যই অমার্জনীয় যে, রাসূলুল্লাহর প্রিয় দৌহিত্র ও ফাতেমার কলিজার টুকরা ইমাম হোসায়নের নিরাপত্তা ও প্রাণরক্ষার কোন উদ্যোগ সে নেয় নি। এমনকি ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। —অনুবাদক)

১. তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ৩১৩, আল বিদায়াসহ অন্যান্য গ্রন্থেও এ প্রস্তাবের উল্লেখ রয়েছে। জনৈক বর্ণনাকারীর মতে অবশ্য হযরত হোসায়ন এ ধরনের কোন প্রস্তাব দেন নি, কিন্তু বিপরীত রিওয়ায়েতের সংখ্যা অধিক বিধায় সেটাই গ্রহণযোগ্য।

কয়েকটি মৌলিক আলোচনা

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র বিরুদ্ধে উত্থাপিত মাওলানা মওদূদীর সব ক'টি অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত শেষে এবার আমরা পূর্ব প্রতিশ্রুত কয়েকটি মৌলিক আলোচনায় অগ্রসর হতে যাচ্ছি।

ছাহাবাদের আদালত ও ন্যায়পরতা

সবচে' গুরুতর যে কারণে দেশের চিন্তাশীল আলেম সমাজ মাওলানা মওদূদীর خلافت و ملوكيت (খিলাফত ও রাজতন্ত্র) বইটির বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন তা এই যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে এ বইয়ের বিষয়-বক্তব্য মেনে নিলে ছাহাবাদের 'আদালত' তথা বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরতাসম্পর্কিত মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। অথচ এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌল বিশ্বাস। মাওলানা মওদূদী তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে 'আদালত' ও ন্যায়পরতা সম্পর্কিত আকীদাটি নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে এ অভিযোগের একটা চলনসই জবাব দেয়ার প্রয়াসে প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা 'মসিলিপ্ত' করেছেন। কিন্তু সত্যকথন অমার্জনীয় অপরাধ না হলে আমাদের বক্তব্য এই যে, মাওলানা তাঁর সবটুকু লেখনী প্রতিভা ও বাকনৈপুণ্য প্রয়োগ করেও মূল প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন মীমাংসা দিতে পারেন নি।

الصحابة كلهم عدول

'সকল ছাহাবা 'আদিল-বিশ্বস্ত ও ন্যায়পর।'

এ আকীদার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাওলানা সাহেব বলেন—

'আদালত' তথা বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরতার অর্থ এ নয় যে, ছাহাবাদের জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে বরং 'হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে' তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার কথাই শুধু বলা হয়েছে। এ অভিনব দাবীর স্বপক্ষে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

'কোন ব্যক্তির জীবনে 'আদালাত' তথা ধার্মিকতা পরিপন্থী কোন আচরণ প্রকাশ পেলে গোড়া থেকেই কি তার 'আদালত' গুণটি বাতিল বলে গণ্য হবে?

এবং এর ফলে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কি আমরা তাকে অনির্ভরযোগ্য ধরে নেবো? আমার মতে কোন ব্যক্তির জীবনে সামগ্রিকভাবে 'আদালত' ও ধার্মিকতা বিদ্যমান থাকলে কখনো কখনো দু'একটি কিংবা দু'চারটি 'আদালত' পরিপন্থী কাজ করে ফেলার অপরাধে তাঁর 'আদালত' ও ধার্মিকতা বাতিল হয়ে যায় না এবং ধার্মিকের পরিবর্তে তাকে ফাসিক বা অবিশ্বস্ত বলা যায় না।'

আমাদের মতে মাওলানার এ বক্তব্য অতিশয় ঘোলাটে ও অস্পষ্ট। কেননা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ছাহাবাদের 'আদালত' ও ধার্মিকতার তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রথমতঃ ছাহাবাগণ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ নবী রাসূলের মত তাঁরাও মাসুম ও নিষ্পাপ।

দ্বিতীয়তঃ কর্মজীবনে (আল্লাহ না করুন) ছাহাবাগণ ফাসিক ও অধার্মিক হতে পারেন, কিন্তু হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্ণ 'আদিল (ধার্মিক ও আস্থাভাজন)।

তৃতীয়তঃ ছাহাবাগণ যেমন নিষ্পাপ নন, তেমনি অধার্মিকও নন। অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ তাঁদের কারো জীবনে কখনো দু'একটি বা দু'চারটি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও পর-মুহূর্তেই তাঁরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে নিতেন। (আল্লাহ পাকও তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন) সুতরাং সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ভিত্তিতে তাঁদের কাউকে ফাসিক আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। মোটকথা, কোন ছাহাবীর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে এ কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, পাপাচারকে তিনি কর্মজীবনে নীতি ও পলিসিরূপে গ্রহণ করেছেন; তাই তিনি ফাসিক ও অধার্মিক।

ছাহাবাদের 'আদালত' ও ন্যায়পরতা সম্পর্কিত উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যার প্রথমটি তো মাওলানা সাহেবের মতে এবং আমাদেরও মতে গলদ ও ভ্রান্তিপূর্ণ। কিন্তু অবশিষ্ট দু'টি ব্যাখ্যার কোনটি যে তাঁর পছন্দ, সে কথা তিনি তার সুদীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বক্তব্যের কোথাও পষ্ট করে বলেন নি।

তাঁর বক্তব্যের অর্থ যদি এই হয় যে, হাদীছ বর্ণনার গণ্ডিতে ছাহাবাদের 'আদালত ও ধার্মিকতা প্রশ্নাতীত হলেও কর্মজীবনের অঙ্গনে তাঁদের ফাসিক বা অধার্মিক হওয়া বিচিত্র নয়, তাহলে বলবো; হয়ত বা নিজের অজান্তেই এক ভয়ঙ্কর ভ্রান্তির চোরাবালিতে তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। অথবা বলবো; ঈমান-আকীদার সুরক্ষিত সরোবরে খাল কেটে কুমির আনার বোকামিতে লিপ্ত রয়েছেন। কেননা কর্মজীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে কোন ছাহাবীকে ফাসিক ও

অধার্মিক ধরে নিয়ে কেবলমাত্র হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁকে ফিরেশতা মনে করার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। দুনিয়ার স্বার্থে অবলীলাক্রমে যে ভদ্রলোক ঘুষ, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন, তিনি সেই স্বার্থ উদ্ধারের মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে কেন জাল হাদীছ বর্ণনা করতে পারবেন না? বরং স্বার্থসিদ্ধির এটাই তো সহজতম উপায়! কর্মজীবনের মিথ্যুক, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এসে কোন বুজরুকিতে এমন শিশির ধোয়া নিষ্পাপ মানুষটি বনে যাবেন যে—

'কোন পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কখনো কোন জাল হাদীছ বর্ণনা করেন নি, কিংবা আত্মস্বার্থ-পরিপন্থী বলেই কখনো কোন সহী হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন নি।'

হাদীছশাস্ত্রের বরেণ্য ইমামদের নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত এই যে, জীবন ও চরিত্র শুচি-শুভ্র নয় এমন কোন ব্যক্তির কোন হাদীছই কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা প্রতিটি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার প্রমাণিত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হলে সম্ভবতঃ জাল হাদীছের কোন অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং অতঃপর কোন ধাড়িবাজকেই হাদীছ বর্ণনায় উৎরে যেতে আর বেগ পেতে হবে না।

পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যাখ্যাটি যদি তিনি পছন্দ করে থাকেন—তাঁর বক্তব্যের ধারায় অবশ্য তাই মনে হয়— তাহলে আমাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য দূর হয় বটে, কিন্তু গোল বাঁধে অন্যত্র। কেননা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অনাচার ও পাপাচারের যে লম্বা বয়ান ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন, সেগুলোর এক কানা-কড়িও সত্য হলে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'আদিল ও ধার্মিক বলার কোন উপায় থাকে না। এ মজলুম ছাহাবীর বিরুদ্ধে মাওলানা সাহেব যে 'চার্জশীট' দাখিল করেছেন তার উপর একবার দফাওয়ারী নজর বুলিয়ে দেখুন—

১. অযোগ্যপুত্রের অনুকূলে বাই'আত নিতে গিয়ে তিনি বল প্রয়োগ করেছেন, ঘুষ দিয়েছেন এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

২. হাজার বিন আদীর মত ইবাদতগুজার ছাহাবীকে সত্যভাষণের অপরাধে সদলবলে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন।

৩. মুসলিম-কাফির উত্তরাধিকার প্রশ্নে এক নতুন বিদ'আত জারি করেছেন।

৪. শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করে অর্ধেক দিয়ত আত্মসাৎ করেছেন।

৫. গনীমতের সোনা-চাঁদি নিজের জন্য পৃথক করে রাখার ফরমান জারী করেছেন।

৬. জুমু'আর খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইয়ে দিতেন। তাঁর নির্দেশে সকল আঞ্চলিক প্রশাসকও এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিলো।

৭. যিয়াদকে দলে ভিড়ানোর জন্য জাল সাক্ষীর মাধ্যমে পিতার ব্যভিচার প্রমাণ করে 'জারজ সন্তান' যিয়াদকে ভাইরূপে পরিবারভুক্ত করে নিয়েছেন।

৮. অধীনস্থদের তিনি আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন। এবং তাদেরকে স্বেচ্ছাচারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

৯. জনৈক প্রশাসক (তাঁর কার্যত সম্মতিক্রমে) মুসলিম নারীদের দাসী বানিয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে সপরিবারে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

১০. রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা ছিলো তাঁর নীতি ও পলিসি। (পৃঃ ১৭৩)

বলুন দেখি, এতগুলো জঘন্য অপরাধের অপরাধী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বেলায় 'আদালত'-এর এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটি কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? এবং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেই বা কোন্ সুবাদে অতঃপর তাঁকে আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে? তাঁর অনুলিপিকৃত ওহী (আল-কুরআনের অংশবিশেষ) এর অবস্থাই বা কী দাঁড়াবে?

এতগুলো জঘন্য অপরাধের এই লম্বা ফিরিস্তিকে 'দু'একটি গুনাহ করে ফেলা' গোছের হালকা আবরণে ঢাকা দেয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে আমরা কী বলতে পারি? শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কসরত অনেকেই করে শুনি। কিন্তু এ যে একেবারে 'মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা'! তদুপরি মাওলানা সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এ অপরাধগুলো ঘটনাচক্রের ফসল ছিলো না, ছিলো তাঁর রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাজনৈতিক 'পলিসি'। সুতরাং যে 'লেপা-পোছা' ধরনের সাফাই কৈফিয়ত থেকে বাঁচার খায়েশ নিয়ে মাওলানা সাহেব এতটা আদাজল খেলেন, এটা কি তার থেকে ভিন্ন কিছু?

মোটকথা, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যা কিছু লিখেছেন, তার কানাকড়িও সত্য হলে তাঁকে ফাসিক না বলে কোন উপায় নেই। বলাবাহুল্য যে, সে ক্ষেত্রে الصحابة كلهم عدول (সকল ছাহাবী 'আদিল ও ন্যায়পরায়ণ) এই আকীদা ও বিশ্বাস কোনক্রমেই অক্ষত থাকতে পারে না। আর এই একটিমাত্র আকীদা ও বিশ্বাস বিধ্বস্ত হওয়ার অর্থ হলো— ইসলামের সকল আকীদা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়া এবং ইসলামী আহকাম ও বিধি-বিধানের সুউচ্চ ইমারত ধূলোয় মিশে যাওয়া।

ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রকৃতি

মাওলানা মওদূদীর মতে ইতিহাসগ্রন্থ থেকে যে সব বর্ণনা তিনি পেশ করেছেন, সেগুলোকে সনদভিত্তিক চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত নয়। এরপর হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের মাঝে মৌলিক ও প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন—

'(সনদভিত্তিক) বিচার বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতি মূলতঃ আহকাম ও বিধান সংক্রান্ত হাদিছের জন্যই প্রবির্তন করা হয়েছে। ইতিহাসকেও যদি একই মানদণ্ডে বিচার করে দেখার প্রবণতা চালু হয় তা হলে ইসলামী ইতিহাসের অন্তত নয়-দশমাংশই অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।'

আমাদের বক্তব্য এই যে, মাওলানা মওদূদী সাহেব আসলে আলোচ্য-বিষয়ের সঠিক গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। আলোচনার শুরুতেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ছাহাবা-বিরোধপ্রসঙ্গ নিছক ইতিহাস নয়। এটা আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের বুনিয়াদী বিষয় এবং এই একটি মাত্র আকীদাকে কেন্দ্র করে ইসলামী উম্মাহ কয়েকটি ফেরকা বা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গোটা মুসলিম উম্মাহ এতদিন এটাকে আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত বলেই জেনে এসেছে। আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের সকল প্রামাণ্য কিতাবেই অত্যন্ত গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতার সাথে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর মতেও যেখানে দোষদুষ্ট ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা শরীয়তের আহকাম ও বিধান প্রমাণ করা যায় না, সেখানে উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা আকায়েদের কোন বিষয় কিভাবে প্রমাণ করা যাবে?

আকায়েদের ক্ষেত্রে তো আরও অধিক সতর্কতার প্রয়োজন। কেননা ফকীহ ও মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, শরীয়তের আহকাম ও বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহী খবরে ওয়াহিদ[১] যথেষ্ট। কিন্তু 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাস

১. খবরে ওয়াহিদ ঃ একক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদীছ।

নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিছক খবরে ওয়াহিদ যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় বলুন দেখি; শুধু গুটিকতেক দোষদুষ্ট ঐতিহাসিক বর্ণনার ভরসায় কিভাবে এমন নাযুক ও সংবেদনশীল বিষয়ের ফায়সালা করা যেতে পারে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছাহাবীর বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতির অপবাদ আরোপ করা কি এতই লঘু বিষয় যে, বর্ণনাকারীর পরিচয়, আকীদা, চরিত্র, নৈতিকতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর না নিয়ে চোখ-কান বুজে তা মেনে নিতে হবে?

এটা অন্ধবিশ্বাস ও বল্গাহীন ভক্তিশ্রদ্ধার কথা নয়, বরং জ্ঞান ও যুক্তির স্বভাবদাবী। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই। একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে দলিল প্রমাণ ও বিচার তদন্ত ছাড়া তো আমরা তা মেনে নেই না। কোন বিবেকবান ও বাস্তববাদী লোক তা মেনে নিতে পারেনও না। বিষয়টি আরো সহজ ও বোধগম্য করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি।

অনেক বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে তীব্র মতবিরোধ সত্ত্বেও এটা আমরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মত বিবেকহীন তিনি কিছুতেই নন। এমতাবস্থায় কেউ যদি খবর ছড়িয়ে দেয় যে, ঈমান ও বিবেকের সওদা করে অমুক বিদেশী দূতাবাস থেকে তিনি মোটা অংকের অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাহলে কোন রকম বিচার তদন্ত ছাড়াই কি আমরা খবরটা সত্য বলে ধরে নেবো? ভুলে যাবো মাওলানার সারা জীবনের দেশপ্রেম ও 'ধর্ম-সেবা'র কথা?

সংবাদদাতার পরিচয়, বিশ্বাসযোগ্যতা, খবর সংগ্রহের সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা এবং মাঝে কোন 'মিডিয়া' থাকলে তার আস্থাযোগ্যতা, ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা কি তদন্ত বিশ্লেষণ করে দেখবো না? নিরপেক্ষ তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, সংবাদদাতা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিংবা সংগৃহীত খবরের সূত্রটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, অথবা যে ব্যক্তিটি মাধ্যমরূপে কাজ করেছে, মাওলানার প্রতি তার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা আদর্শগত বিরোধ রয়েছে, তাহলে এমন একটা দোষদুষ্ট খবরের উপর ভর করে মাওলানার নিষ্কলুষ চরিত্র ও দেশপ্রেমের গায়ে কলংকের হুল ফুটানো কি কোন বিবেকবান মানুষের জন্য বৈধ কাজ হবে?

ধরে নেয়া যাক; খবরটি নির্ভরযোগ্য ও বহুলপ্রচারিত কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাই বলে কি সংবাদদাতা, সূত্র ও মাধ্যম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া ও তদন্ত করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? কিংবা কোন তদন্তকারীকে কি শুধু এই বলে নিরস্ত করা যাবে যে, পত্রিকার সম্পাদক সাহেব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি; সুতরাং তার

কাগজে ছাপা সকল সংবাদই গ্রহণযোগ্য? তাহলে প্রতিটি সংবাদের শুরুতে সূত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরের বেলায় সংবাদদাতার নাম উল্লেখ করার সার্থকতা কোথায়? কেউ যদি সংবাদদাতার নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে আলোচ্য খবরটি প্রত্যাখ্যান করতে চায় তাহলে কি এ অস্ত্রে তাকে ঘায়েল করা যাবে যে, এখবরটি গ্রহণ না করলে সারা পত্রিকা জুড়ে সংবাদদাতাদের সব খবরই তোমাকে বর্জন করতে হবে। অনুকূল খবরের বেলায় যাকে নির্ভরযোগ্য বলে মাথায় তুলে নেবে তাকেই আবার প্রতিকূল খবরের বেলায় নির্ভরযোগ্য নয় বলে ছুঁড়ে ফেলবে—এটা কেমন যুক্তি?

আমাদের বিশ্বাস, বিবেকবান যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এ সকল প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই আমরা পাবো। তাহলে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সহ অন্যান্য মজলুম ছাহাবার বেলায় কেন এর ব্যতিক্রম হবে? কেনই বা ছাহাবাচরিত্রে কলঙ্ক লেপনকারীদের বিরুদ্ধে 'রিজালশাস্ত্রের কেতাব খুলে বসলে' মাওলানা সাহেব তাঁর স্বভাব-গাম্ভীর্য হারিয়ে অতটা রগচটা হয়ে পড়েন?

মাওলানা বেশ জোর দিয়ে বলেছেন যে, হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠির ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাঁর মতে ওয়াকিদী, সাইফ বিন ওমর, কাল্‌বী ও আবু মুহান্নাফের মত বর্ণনাকারীরা আহকামসম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভর করতে হবে। কেননা আহকামসম্পর্কিত হাদীছের মত ইতিহাসের ক্ষেত্রেও যদি তাদেরকে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করা হয়, তাহলে আমাদের ইতিহাসের অন্তত নয় দশমাংশ অকেজো হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আগেই আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করে এসেছি। আবারো বলছি; ইতিহাসের ক্ষেত্রে এদের উপর নির্ভর করার অর্থ এ নয় যে, আহকাম ও আকায়েদের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ বর্ণনাগুলোও নির্দ্বিধায় আমাদের মেনে নিতে হবে। ইতিহাসগ্রন্থের সব আলোচনাই নিছক ইতিহাস হবে এমন বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। সুতরাং আকীদা ও আহকামসম্পর্কিত কোন বিষয় ইতিহাসগ্রন্থে আলোচিত হলে তার সত্যাসত্য পরখ করে দেখার জন্য হাদীছশাস্ত্রে অনুসৃত নীতিমালা এখানেও আমরা অবশ্যই প্রয়োগ করবো।

কোন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে অবশ্য শাস্ত্রবিশারদগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, আহকাম ও বিধানসম্পর্কিত বর্ণনায় এরা গ্রহণযোগ্য নয়, তবে ইতিহাস ও গাযওয়াসম্পর্কিত বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এ কথা বলে তাঁরা 'আহকাম ও

আকায়েদের' সাথে সম্পর্কহীন ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর দিকেই মূলতঃ ইংগিত করেছেন। যেমন কোন্ যুদ্ধ কত সালে হয়েছে? উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কত ছিলো? সমরনায়ক কে ছিলেন? জয়-পরাজয় কোন পক্ষের হয়েছিলো? এ ধরনের সাদামাটা বিষয়ে দুর্বল বর্ণনাকারীদের বর্ণনাও বরদাশত করা যেতে পারে। কেননা 'আহকাম ও আকায়েদের' সাথে এগুলোর সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছাহাবাদের অন্তর্বিরোধ ও 'আদালত'সংক্রান্ত নাযুক বিষয়ে এসব চিহ্নিত বর্ণনাকারীদের বর্ণনা কোনক্রমেই বরদাশত করা যেতে পারে না। কেননা এগুলো সরাসরি আকায়েদের সাথে সম্পর্কিত এবং একমাত্র এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই ইসলামে কয়েকটি বড় বড় ফেরকার জন্ম হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা-এর মজবুত দলীল প্রমাণের আলোকেই শুধু মীমাংসা হতে পারে।

একটি সহজ সরল উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অনায়াসে বোধগম্য হতে পারে। ধরুন, খবরের পাতায় হররোজ আমরা হাজারটা খবর পড়ি এবং সেগুলো বিশ্বাস করার জন্য সংবাদদাতার পরিচয় জানার কোন গরজ অনুভব করি না। কিন্তু একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কোন খবর ছাপা হলে এত সহজে আমরা তা মেনে নিতে রাজী হই না, বরং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের জোর দাবী জানাই এবং তদন্তে সংবাদদাতার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হলে প্রতিবাদে সোচ্চার হই; আন্দোলন গড়ে তুলি।

অমুক শহরে বাস দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা গেছে, অমুক দেশে ভূমিকম্পে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অমুক মাঠে অমুক দলের বিরাট জনসভা হয়েছে। এ ধরনের সাদামাটা খবর কোন দায়িত্বশীল কাগজে ছাপা হলে লোকেরা সেগুলো সত্য বলেই ধরে নেয়। সংবাদদাতা কট্টর নাস্তিক হলেও কেউ বড় একটা গায়ে মাখে না। কিন্তু একই সংবাদদাতা যদি খবর পরিবেশন করে যে, অমুক মসজিদের ইমাম তহবিল তসরুফে ধরা পড়েছেন, কিংবা অমুক রাজনৈতিক নেতা বিদেশী দূতাবাস থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাহলে দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের রিপোর্টিং এর উপর ভরসা করার পরিবর্তে অবশ্যই আমরা সম্ভাব্য সকল সূত্রে খবরটির সত্যাসত্য যাচাই করার চেষ্টা চালাবো। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই যুক্তির দাবী।

কিন্তু আপনি যদি এই বলে মাঝ পথে বাধ সেধে বসেন যে, হয় তুমি কাগজের নয় দশমাংশ খবর নাকচ করে দাও, কিংবা অন্যান্য খবরের মত এ খবর দু'টিও নির্বিবাদে মেনে নাও তাহলে সত্যি বলছি; হায় আল্লাহ্ বলে মাথায়

হাত দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না। তবে একথাও বলে রাখছি যে, মানুষ তখন আপনার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে পড়বে। আপনি হয়ত বলবেন, মানুষ আমার মগজ নিয়ে মশ্‌করা করবে এমন বেমক্কা আবদার করতে যাবো কোন দুঃখে? বেশ ভালো কথা; কিন্তু জনাব! ইসলামের ইতিহাস তাহলে এমন লাওয়ারিশ হলো কেন যে, যিনি যেমন ইচ্ছে গল্প শুনিয়ে যাবেন, আর আমরা সত্যতা যাচাই করার জন্য 'রিজাল শাস্ত্রের কেতাব' পর্যন্ত খুলতে পারবো না?

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ শুরু থেকে এ কথাই বলে আসছেন সাফসুতরা ভাষায়। আল্লামা আহমাদ বিন হাজার আল হায়তামী তাঁর সুবিখ্যাত كتاب الصواعق গ্রন্থে লিখেছেন—

الواجب ايضا على كل من سمع شيئا من ذلك ان يثبت فيه ولا ينسبه الى احد منهم بمجرد رؤيته فى كتاب اوْ سماعه من شخص بل لابد ان يبحث عنه حتى يصح عنده نسبته الى احدهم فحينئذ الواجب ان يلتمس لهم احسن التاويلات ـ

'(ছাহাবা কেরামের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সম্পর্কে) কোন বর্ণনা কর্ণগোচর হলে কর্তব্য হলো পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা; শুধু কিতাবের পাতায় দেখে কিংবা কারো মুখে শুনে কোন ছাহাবী সম্পর্কে অশোভন উক্তি না করা। এমনকি পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণের পর ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে সে ক্ষেত্রেও অবশ্যকর্তব্য হলো সেগুলোর সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা।'[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন—

لايجوز لاحد ان يذكر شيئا مما وقع بينهم ليستدل به على بعض نقص من وقع له ذلك والطعن فى ولايته الصحيحة او ليغرى العوام على سبهم وثلبهم ونحو ذلك من المفاسد – ولم يقع ذلك الا للمبتدعة وبعض جهلة النقلة الذين ينقلون كلما راوه ويتركونه على ظاهره غير طاعنين فى سنده

১. পৃঃ ১২৯—এ উদ্ধৃতিটুকুর জন্য আমি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (খতিব, আহলে হাদীস মসজিদ, মুস্তাফাবাদ)-এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ولامشيرين لتاويله وهذا شديد التحريم لما فيه من الفساد العظيم وهو اغراء العامة ومن فى حكمهم على تنقيص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يقم الدين الا بنقلهم الينا كتاب الله وما سمعوه وشاهدوه من نبيه ومن سنته الغراء الواضحة البيضاء ـ

'ছাহাবা-বিরোধসংক্রান্ত ঘটনাগুলোর সূত্র ধরে তাঁদের খুঁত বের করা, ছাহাবাসুলভ মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা কিংবা তাঁদের সমালোচনার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে উস্‌কে দেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। আসলে এসব হচ্ছে বিদ'আতপন্থীদের প্রিয় কর্ম এবং মূর্খ লেখকদের সখের বিষয়। কোন কিছুর সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করেই এরা তা বিবৃত করতে শুরু করে। সূত্র ও সনদের বিচার বিশ্লেষণ এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানের ধার বড় একটা ধারে না। এগুলো অবশ্যই জঘন্যতম অপরাধ। কেননা এ থেকে বিরাট ফিতনার উৎপত্তি হতে পারে। এটা আসলে সাধারণ মুসলমানদেরকে ছাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে উস্‌কে দেয়ার নামান্তর। অথচ ছাহাবাগণই হলেন আমাদের হাতে দ্বীন পৌঁছার মাধ্যম। কোরআন-সুন্নাহ (শব্দ ও মর্মসহ) তাঁরাই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। (তাত্‌হিরুল জিনান ওয়াল্লিসান পৃঃ ৬৫)

অন্যদিকে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রঃ) আহলে সুন্নাতের আকীদাগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে লিখেছেন—

ان هذه الاثار المروية فى مساويهم ماهو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون ـ اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون ، وهم مع ذلك لايعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب فى الجملة ، ولهم من الفضائل والسوابق مايوجب مغفرة مايصدر منهم ان صدر ـ

'আহলে সুন্নাতের আকীদা এই যে, ছাহাবা কেরামের মর্যাদাহানিকর বর্ণনাগুলো কতক নির্জলা মিথ্যা। কতক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতির শিকার। দু'একটি অবশ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে ছাহাবাগণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। কেননা উভয়পক্ষই ইজতিহাদ করেছেন। একপক্ষ নির্ভুল

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। আর অপর পক্ষ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের আকীদা এ নয় যে, সকল ছাহাবীই সব ধরনের সগীরা-কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত; বরং সামগ্রিকভাবে তাঁদের দ্বারাও গুনাহ হতে পারে। তবে তাঁদের ফজিলত ও নেক আমল এত অধিক যে মাগফিরাত লাভের জন্য সেগুলো যথেষ্ট।'

(আর-রওযাতুন নাদিয়া শরহে 'আকীদাতুত্তাহাবিয়া পৃঃ ৪৪১)

আহলে সুন্নাতের যে কোন আকায়েদগ্রন্থ খুলে দেখুন। ছাহাবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের বিষয়টিকে তারা আকীদাসংশ্লিষ্ট বলেই রায় দিয়েছেন। সুতরাং চিহ্নিত ও সনদহীন কিংবা রুগ্ন সনদের কোন বর্ণনা এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ছাহাবাবিরোধপ্রসঙ্গে তো এ মূলনীতির আরো কঠোর অনুসরণ আবশ্যক। কেননা, সাবাঈ[1] প্রচারণার 'বরকতে' তখনকার নির্ভুল ও বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার করা কারো পক্ষেই আজ আর সম্ভব নয়।

দেখুন; যে সব চিহ্নিত বর্ণনার ডানায় ভর করে মাওলানা সাহেব আজ ভীমরুলের মত ছাহাবাচরিত্রে কলংকের হুল ফুটিয়ে চলেছেন, সেগুলো কিন্তু চতুর্দশ শতকের চমকপ্রদ নব-আবিষ্কার নয়। তেরশ বছর ধরে ইতিহাসের পাতায় সেগুলো বর্ণিত হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের কোন আলিম, গবেষক আজ পর্যন্ত হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শিশির-শুভ্র চরিত্রে আঁচ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। হাদীছ, কালাম ও আকায়েদশাস্ত্রের সকল ইমাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথাই ঘোষণা করে এসেছেন যে, হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মতবিরোধ ছিলো নিছক ইজতিহাদনির্ভর। তবে হযরত আলী (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপই ছিলো সঠিক, নির্ভুল ও বাস্তবোচিত। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) দুঃখজনকভাবে ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন।[2]

এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে সকল ইমাম হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বাগী বা বিদ্রোহী শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা সুস্পষ্ট

---

১. ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ্ বিন 'সাবা ও তার অনুগামীচক্র।

২. দেখুন— আন-নিবরাস আলা শরহিল 'আকাইদ পৃঃ ৫৪৯, আস-সাওয়া'ইকুল মুহররাকাহ পৃঃ ১৫৯, শরহুল আকাইদিল ওয়াসিতিয়াহ পৃঃ ৪৪৯-৫১, আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম পৃঃ ১৬৬, মাকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, দফতরে আওয়াল, লাওয়ামিউল আনওয়ার খঃ ২ পৃঃ ৩৮৬, আল মুসামারাহ ফী শরহিল মুসায়ারাহ পৃঃ ১৩২, মিরকাতুল মাফাতিহ খঃ ৫ পৃ ১৪৮, আল ফিকহুল আকবার।

প্রাথমিকভাবে এ কয়টি বরাত দেয়া হল। নতুবা আহলে সুন্নতের এমন কোন আলিমের কথা আমাদের জানা নেই যিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ইজতিহাদী ভুলের অধিক কিছু বলেছেন।

ভাষায় এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, বিদ্রোহ বলার অর্থ হলো, ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সাথে শান্তিচুক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভুল সিদ্ধান্তের উপর ছিলেন। তবে তাঁর এই বিদ্রোহ যেহেতু কতিপয় যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে ছিলো, সেহেতু তাঁকে ভুল পন্থার অনুসারী মুজতাহিদ-ই শুধু বলা যেতে পারে, এর বেশী কিছু নয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব ঘটনা ও বর্ণনা কি আকায়েদশাস্ত্রের ইমাম ও গবেষক আলিমদের চোখে একটি বারের জন্যও পড়ে নি? নাকি দেখেও তারা না দেখার ভান করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শঠতার আশ্রয় নিয়ে আসল ঘটনা চাপা দিয়েছেন? কিংবা নিছক ভক্তি আবেগের বালুচরে ইসলামী আকায়েদের এই সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে গিয়েছেন? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পূর্বসূরী ইমাম মনীষীগণ সম্পর্কে কারো মনের অন্ধ গলিতে এমন চোর লুকিয়ে থাকলে পরিষ্কার ভাষায় তিনি ঘোষণা করুন; 'আহলে সুন্নতের ভ্রান্ত আকায়েদের আমি অনুগত নই।'

আসলে ইতিহাসের এই চিহ্নিত বর্ণনাগুলো মাওলানার মত আমাদের পূর্বসূরী ইমাম মনীষীদের নজরেও পড়েছিলো বৈকি। কিন্তু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে কোন কিছু দেখতে তারা অভ্যস্ত ছিলেন না। সেই সাথে জ্ঞান-পাপ ও ইজতিহাদী ভুলের পার্থক্যও তারা জানতেন ভালোভাবেই। তাই ইতিহাস-অঙ্গনের পেশাদার অপরাধীদের বানানো গল্প-কাহিনীগুলোর যতটা 'সমঝদারি' মাওলানা সাহেব করেছেন ততটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তারা বরং পরিষ্কার ভাষায় পরবর্তীদের সতর্ক করে গিয়েছেন যে, ইতিহাসের এ মরণফাঁদে পা দিয়ে কেউ যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছাহাবীর পবিত্র চরিত্রে গোবর ছিটানোর আত্মঘাতী ভুল না করে।

দেখুন না; ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর খুঁজে খুঁজে এ সকল বর্ণনা সনদসহ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে সংকলন করে গিয়েছেন, আর বিনা মেহনতে সেগুলো হাতের নাগালে পেয়েই তেরশ বছর পরের মাওলানা এমন তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছেন। অথচ একটিবার যদি তিনি এ সম্পর্কে খোদ ইবনে কাছীরের মতামত জানার তকলীফ স্বীকার করতেন তাহলে ইতিহাসের এই পিচ্ছিল বরফে বারবার তাঁকে পিছল খেয়ে পড়তে হতো না। আমাদেরও সব কাজ ফেলে এই অকাজে সময়ের 'শ্রাদ্ধ' করতে হতো না। সিফ্ফিন যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আল্লামা ইবনে কাছির লিখেছেন—

وهذا مذهب اهل السنة والجماعة ان عليا هو المصيب وان كان معاوية مجتهدا ، وهو ماجور ان شاء الله ـ

'হযরত আলী (রাঃ) নির্ভুল পথে ছিলেন। তবে মুজতাহিদ হওয়ার কারণে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)ও ইনশাআল্লাহ বিনিময় লাভ করবেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব।'[1]

আমরা মনে করি; চোখ কান যাদের অন্তত অর্ধেক খোলা আছে, এরপর তারা মাওলানা মওদূদীর এ ভয়ঙ্কর নির্দেশ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না যে, ছাহাবাচরিত্রে কলঙ্কলেপনকারী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো কোন রকম বিচার তদন্ত ছাড়াই 'জামাই আদরে' বরণ করে নিতে হবে এবং কোন অবাধ্য এ নির্দেশ অমান্য করে 'রিজাল শাস্ত্রের কেতাব' খুলে বসলে তার হাত কেটে দেয়া হবে, চোখ তুলে ফেলা হবে।

বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর স্বনামধন্য গবেষক মাওলানার এ অভিনব গবেষণা মেনে নিলে আল্লাহর রাসূলের কোন ছাহাবীর ইজ্জত-আবরুই আর নিরাপদ থাকতে পারে না। কেননা আগামী দিনের নতুন কোন গবেষক এ ধরনের দুর্বল ও দোষদুষ্ট রিওয়ায়েতের উপর ভর করে খুব সহজেই সিদ্দীকী-ফারুকী চরিত্রেও কলঙ্ককালিমা আবিষ্কার করে ফেলবে। এ ধরনের আত্মঘাতী ভ্রান্তি সম্পর্কে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে খোদ মাওলানা মওদূদী উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়—

'এ ধরনের ইতিহাস যদি আপনি বিশ্বাস করে বসেন, তাহলে আপনাকে কোরআনের বাহক এবং হৃদয় ও আত্মার সংশোধক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত-পবিত্র ব্যক্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে। ভুল শব্দের মতই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে তাঁর শিক্ষা-সাধনার সকল ফলাফল এবং স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই শ্রেষ্ঠ মানব তেইশ বছরের তাবলীগ ও হিদায়াতের মাধ্যমে যে মোবারক জাম'আত গড়ে তুলেছিলেন। বদর, অহুদ, আহযাব ও হোনায়নের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়ার বুকে যারা ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা চির-বুলন্দ করেছিলেন, সেই মোবারক জামা'আতের চরিত্র ও নৈতিকতা, ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা আজকের দুনিয়াপূজারীদের চেয়ে কণামাত্র ভিন্ন ছিলো না।' (রাছায়েল ও মাছায়েল খঃ ১ পৃঃ ৭২ ইসলামিক পাবলিকেশনস, লাহোর ১৯৫১)

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খঃ ৭ পৃঃ ২৭৯। আল বিদায়া হচ্ছে মাওলানা মওদুদীর অতি প্রিয় উৎস-গ্রন্থ এবং ইবনে কাছীরের ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার প্রশংসায় তিনি যাকে বলে 'পাঁচমুখ'।

কিন্তু হায়! মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে মাওলানা নিজেই ভুলে গেলেন তাঁর সতর্কবাণী। একেই বুঝি বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফতের সঠিক মূল্যায়ন

সঙ্গত কারণেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমরা মেনে নিলাম; হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত যাবতীয় অভিযোগ অসত্য, তাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক এবং তাঁর নীতি ও কর্ম দোষমুক্ত, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁর শাসন-খিলাফতের প্রকৃতি ও স্বরূপ কী ছিলো? খিলাফতের রাশেদার সঙ্গে তাঁর খিলাফতের তুলনামূলক অবস্থানই বা কী ছিলো?

এ প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করছি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত কোন অবস্থাতেই সমপর্যায়ের ছিলো না। উল্লেখ করার মত পার্থক্য অবশ্যই ছিলো, কিন্তু সে পার্থক্যের যে চিত্র মাওলানা মওদূদী এঁকেছেন তা আগাগোড়া যুক্তিবিরুদ্ধ ও বাস্তবতাবর্জিত; সুতরাং আহলে সুন্নতের আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। তাঁর লেখার কেরামতিতে সাধারণ পাঠকের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, হযরত আলী (রাঃ)-র শাহাদাতের সাথে সাথে গোটা পরিস্থিতি হঠাৎ বুঝি ডিগবাজি খেয়েছিলো। অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদা ছিলো যাবতীয় কল্যাণ ও সৌন্দর্যের এক অনুকরণীয় আদর্শ। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার হাতে নেয়ার সাথে সাথে উম্মাহর জীবন থেকে সেগুলো হঠাৎ উবে গেলো এবং রাজতন্ত্রের যাবতীয় দোষ, অকল্যাণ ও পাপাচার একযোগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

খেলাফতে রাশেদার কল্যাণযুগে পুণ্যে ও পবিত্রতায় মুসলিম সমাজ ছিলো মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সমাজ। কিন্তু মুহূর্তের ব্যবধানে সে সমাজেই প্রবৃত্তি ও পাশবিকতা তার সকল বিভৎসতা ও জঘন্যতা নিয়ে শিকড় গেড়ে বসলো।

চল্লিশ হিজরী পর্যন্ত খলীফার পক্ষে শরীয়তের একটি সাধারণ বিধান লংঘন করাও ছিলো কল্পনার অতীত। কিন্তু একচল্লিশ হিজরী শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পরিস্থিতি শরীয়তলঙ্ঘন, দ্বীনের বিকৃতিসাধন ও বিদ'আত প্রবর্তনের রূপ ধারণ করলো।

চল্লিশ হিজরীতে ঘুষ লেনদেনের পাপধারণা কারো হৃদয়ের পূণ্যভূমিতে ছায়াও ফেলতে পারে নি, কিন্তু একচল্লিশ হিজরীতে শাসক-শাসিত সবার কাছে তা হয়ে গেলো মায়ের দুধের চেয়েও প্রিয়।

চল্লিশ হিজরীতে কাফিরকে পর্যন্ত গালমন্দ করা হতো না। আর একচল্লিশ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র গালাগালের 'ঝড়' শুরু হলো।

চল্লিশ হিজরীতে সাধারণ সৈনিকের মনেও গনীমতের মাল খেয়ানতের কুবাসনা জাগতো না। কিন্তু একচল্লিশ হিজরীতে খোদ খলীফাতুল মুসলিমীন গণীমতের মাল আত্মসাতের মতলবে রীতিমত ফরমান জারী করতে লেগে গেলেন।

চল্লিশ হিজরীতে খিলাফত ছিলো ন্যায় ও ইনসাফের উজ্জ্বল প্রতীক, আর একচল্লিশ হিজরীতে জুলুম-স্বেচ্ছাচারই হয়ে দাঁড়ালো কেন্দ্রের নীতি।

চল্লিশ হিজরীতে শাসক-শাসিতের ঈমানী বল এবং আল্লাহ-ভীতি এমনই জাগ্রত ছিলো যে, সাধারণ মানুষও প্রকাশ্য রাজপথে খলীফার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারতো। অথচ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে খলীফাতুল মুসলিমীনের জুলুম নির্যাতন এমনই চরম রূপ ধারণ করলো যে, 'মুখে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো, বিবেকের টুটি চেপে ধরা হলো এবং চাবুকের নির্মম কষাঘাত হলো সত্য-ভাষণের পুরস্কার।'

মোটকথা, চল্লিশ হিজরী শেষ হতে না হতেই ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির এমন সর্বনাশা প্লাবণ দেখা দিলো, যা বিশ শতকের 'সভ্য নাগরিক' হিসাবে পৃথিবীতে আমরা আজ দেখতে পাই।

মাওলানা মওদূদীর শৈল্পিক হাতে আঁকা মুসলিম উম্মাহর অবক্ষয়ের এ চিত্র যেমন ইতিহাসের উত্থান-পতনের ক্রমবিবর্তন-ধারার বিরোধী তেমনি তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ভবিষ্যদ্বাণীরও পরিপন্থী। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন—

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -

আমার যুগই হলো সর্বোত্তম যুগ, তারপর এর সংলগ্ন যুগ, তারপর এর সংলগ্নযুগ।

তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য হলো; খেলাফতে রাশেদা ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য অবশ্যই ছিলো; কিন্তু তা তাকওয়া ও ধর্মহীনতার, কল্যাণ ও দুষ্কৃতির এবং ন্যায় ও দুর্নীতির পার্থক্য ছিলো না। সে পার্থক্যের সবচেয়ে নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন মহান দানবীর হাতেম তাইয়ের পুত্র ছাহাবী হযরত আদী বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হযরত আদী বিন হাতিম ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর এক জান-কোরবান অনুসারী। সিফফিনসহ সকল যুদ্ধেই তিনি হযরত আলীর পক্ষে প্রথম কাতারে লড়াই করেছেন। এমনকি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলেও তিনি তাঁর পূর্ব অবস্থানে অটল ছিলেন। সেই আদী বিন হাতিমকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে মন্তব্য করার অনুরোধ জানালেন। হযরত আদী বিন হাতিম তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পাল্টা জানতে চাইলেন, তোমার ভয়ে মিথ্যে বলবো; না আল্লাহর ভয়ে সত্য বলবো?

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)ও তাঁর মুখের স্বভাবসুলভ স্মিত হাসি অটুট রেখে বললেন, (আমার পক্ষ থেকে কোন ভয় নেই) আল্লাহর ভয়ে সত্য বলো। তখন আদী বিন হাতিম বললেন এবং সোনার হরফে লিখে রাখার মত কথাই বললেন—

عدل زمانكم هذا جور زمان قد مضى وجور زمانكم هذا عدل زمان ما يأتى -

'তোমার আমলের ইনসাফ আগের আমলের জুলুম সমতুল্য, আর তোমার আমলের জুলুম আগামী যুগের ইনসাফ সমতুল্য।'

সুবহানাল্লাহ! একেই বলে ছাহাবীর অন্তর্জ্ঞান ও ঈমানী প্রজ্ঞা! এ বক্তব্যে হযরত আদী বিন হাতিম বোঝাতে চেয়েছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পুণ্য যুগে সতর্কতা, দায়িত্ব-সচেতনতা ও আল্লাহ-ভীতির যে কঠোর মানদণ্ড সমুন্নত ছিলো, পরে তা সর্বাংশে অক্ষুণ্ন থাকে নি। খোলাফায়ে রাশেদীন শরীয়তী বিধানের 'আযীমত' তথা চূড়ান্তস্তর অনুসরণ করতেন। পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) 'রুখসাত' তথা উদার বৈধতার উপর আমল করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম সতর্কতার দিক বিবেচনা করতেন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিষয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বৈধতার গণ্ডিতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন না। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদীন আযীমত তথা

নিরংকুশ সতর্কতার দিক বিবেচনা করে পূর্ণ যোগ্যতা সত্ত্বেও আপন পুত্রদের মনোনয়নদানে সম্মত হন নি, অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ ছিলো। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সে বৈধতার পথ ধরে পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সময় অবশ্য তাঁর এ পদক্ষেপ ক্ষতিকর বলে প্রমাণ করেছে।

খোলাফায়ে রাশেদীন আযীমত তথা কঠোরতম সতর্কতার উপর আমল করে অকল্পনীয় অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অনুসরণ করতেন। এমনকি ইসলামী খিলাফতের দরিদ্রতম মানুষটির জীবনযাত্রাও ছিলো সে তুলনায় উন্নতমানের। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর জীবনে কিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্যের পরশ বুলিয়েছিলেন।[১]

খোলাফায়ে রাশেদীনের দায়িত্বসচেতনতা ও কোমল অনুভূতি এমন ছিলো যে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাঁরা মানুষের খোঁজ নিয়ে বেড়াতেন। নিজ হাতে ইয়াতিম-বিধবার সেবা করতেন। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ইতিহাস এ ধরনের কোন ঘটনা আমাদের শোনায় নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রজ্ঞা; ইজতিহাদ ও মতামত এমন সরল নির্ভুল ছিলো যে, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল উম্মাহকে তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁদেরও অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একাধিক বার বড় ধরনের ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন।

মোটকথা; এসব দিক বিবেচনা করেই হযরত আদী বিন হাতিম বলেছেন, 'তোমাদের আমলের ইনসাফ আগের আমলের জুলুম সমতুল্য।'

আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের ইমামগণও উভয় শাসনামলের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গবেষক আলিম আল্লামা আব্দুল আযীয ফরমাহী (রঃ) লিখেছেন—

قلت : لاهل الخير مراتب بعضها فوق بعض، وكل مرتبة منها يكون محل قدح بالنسبة الى التى فوقها ... ولذا قيل حسنات الابرار سيئات المقربين. وفسر بعض الكبراء قوله عليه السلام انى لاستغفر الله فى اليوم اكثر من سبعين مرة بانه كان دائم الترقى وكلما كان

১. অবশ্য সে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার চিত্রও ইতিহাস সংরক্ষণ করে রেখেছে। আল বিদায়ার মতে তালিযুক্ত জামা গায়ে দামেস্কের বাজারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন হর-হামেশা এবং রাতের বেঁচে যাওয়া রুটি ছিলো তাঁর সকালের নাস্তা। এই ছিলো তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের নমুনা।

يترقى الى مرتبة استغفر عن المرتبة التى قبلها، واذا تقرر ذلك فنقول : كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا فى المباحات وكان سيرتهم سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى الصبر على ضيق العيش والجهد، واما معاوية (رض) فهو وان لم يرتكب منكرا لكنه توسع فى المباحات ولم يكن فى درجة الخلفاء الراشدين فى اداء حقوق الخلافة لكن عدم المساواة بهم لايوجب قدحا فيه -

'নেককার লোকদের মাঝে স্তরতারতম্য রয়েছে এবং প্রত্যেক স্তর উচ্চতর স্তরের বিচারে অপূর্ণ প্রতিভাত হবে। তাই বলা হয়, 'সজ্জনদের পুণ্য নিকটজনদের পাপ।'

'দিনে সত্তরবারের বেশী আমি আল্লাহর মাগফেরাত কামনা করি।' এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী বলেছেন, মর্যাদা ও নৈকট্যের উচ্চতর স্তরে তাঁর উত্তরণ ঘটতো প্রতিমুহূর্তে। ফলে নিম্নতর স্তরের অসম্পূর্ণতার কথা ভেবে প্রতিনিয়ত তিনি ইসতিগফার করতেন।

এটা সাব্যস্ত হওয়ার পর আমরা বলতে চাই যে, বৈধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও খোলাফায়ে রাশেদীন কঠোর সংযম অবলম্বন করেছিলেন এবং সবর, ধৈর্য ও মুজাহাদার পথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও চরিত্রের হুবহু অনুসরণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) অবৈধতা পরিহার করলেও বৈধ বিষয়গুলোর বেলায় অপেক্ষাকৃত উদার ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও খোলাফায়ে রাশেদীনের সমপর্যায়ের সতর্ক-সাবধান তিনি ছিলেন না। তবে এই অসমতা তাঁর জন্য দোষের বা অসম্মানের নয়। (আন-নিবারাস আলা সারহিল আকায়েদ পৃঃ ৫১০)

প্রবীণ ছাহাবাগণ মাঝে মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) -এর যে সমালোচনা করতেন তার কারণ এই যে, সবকিছু তাঁরা খেলাফতে রাশেদার স্বচ্ছ আয়নায় বিচার করতেন। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)- এর নূরানী জীবন ও শাসনপদ্ধতি দু'চোখ ভরে যারা দেখতে পেয়েছেন এবং খিলাফতে রাশেদার কল্যাণ, বরকত ও রহমতের বারিধারায় যারা স্নাত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, হযরত মু'আবিয়ার শাসনপদ্ধতিতে তাদের তৃপ্ত ও তুষ্ট না হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যের চোখে চাঁদের যত অপূর্ণতাই ধরা পড়ুক

মাটির মানুষের চোখে তো সে চিরসুন্দর, এমন কি চাঁদের কলঙ্কেও সে হয় বিমুগ্ধ।

মোটকথা, উম্মাহর জন্য খোলাফায়ে রাশেদীন উজ্জ্বলতম আদর্শ হলে নিঃসন্দেহে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হলেন উজ্জ্বল আদর্শ। সুতরাং প্রবীণ ছাহাবাদের সমালোচনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে হাতিয়ার করে হযরত মু'আবিয়ার চরিত্রে কলঙ্ক আবিষ্কার করার অধিকার তেরশ বছর পরের কোন বিলাসী গবেষকের নেই। অধিকার নেই তাঁর ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার ও কল্যাণপূর্ণ খিলাফতের স্বচ্ছ সরোবরে বিশ শতকের কর্দমাক্ত রাজনীতির জঞ্জাল-আবিলতা নিক্ষেপের। যদি কেউ করে তাহলে তার সম্পর্কে মানুষ ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, 'নিমক হারাম'।

ছাহাবাকেরামও জানতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীন ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলের যে পার্থক্য, তা ছিলো পূর্ণ ও পূর্ণতরের পার্থক্য, উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতরের পার্থক্য।

তাই কাদেসিয়ার মহান সেনাপতি হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-র মত বিশিষ্ট ছাহাবীকেও হযরত মু'আবিয়ার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে কবরের মাটি ভিজিয়ে বলতে শুনি—

مارأيت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا البيت يعنى معاوية

উসমানের পরে এই ঘরের বাসিন্দা মু'আবিয়ার চেয়ে অধিক সুবিচারকারী কউকে আমি দেখি নি। (আল-বিদায়া পৃঃ ১৩৩)

পরবর্তী যুগের বরেণ্য ব্যক্তিগণ সে চোখেই তাঁকে দেখেছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইমাম আমাশের মজলিসে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের ইনসাফ ও সুবিচারের কথা উঠলে তিনি বললেন, 'উমর বিন আব্দুল আযীযের সুবিচারেই তোমরা বিমুগ্ধ। হযরত মু'আবিয়াকে যদি দেখতে তাহলে তোমাদের কী হতো!' সবাই জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি তাঁর সহনশীলতার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, 'না, আমি তাঁর সুবিচারের কথাই বলছি।'

হযরত কাতাদাহ, মুজাহিদ ও হযরত আবু ইসহাকের মত বিশিষ্ট তাবেয়ীন সে যুগের লোকদের সম্বোধন করে বলতেন, 'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনামল দেখার সৌভাগ্য হলে তোমরা তাঁকে হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতে। (মিনহাজুস সুন্নাহ পৃঃ ১৮৫)

এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি যে সেই মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁর সেবা, নিষ্ঠা ও ধার্মিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর রাসুল দু'আ দিয়েছেন—

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به

'হে আল্লাহ! তাকে পথ প্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত করে দাও এবং তার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান করো। (তাবয়ীরে মুসনদিস সুন্নাহ খঃ ২২, পৃঃ ৩৫৬)

প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, 'আমার পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত (অটুট) থাকবে। তারপর কর্তনকারী রাজতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করবে।'

আর হযরত হাসান (রাঃ)-র খিলাফতের শেষ মাথায় এসেই কথিত ত্রিশ বছরের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকালকে রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে না কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিছগণের একাংশ সনদের বিচারে আলোচ্য হাদীছ 'বিশুদ্ধ নয়' বলে রায় দিয়েছেন। আল্লামা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—

هذا حديث لايصح

এ হাদীছ বিশুদ্ধ নয়। (আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম)

পক্ষান্তরে গবেষক আলিমদের মতে হাদীছটিকে বিশুদ্ধ ধরে নিলেও তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কেননা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রঃ)-র বরকতময় যামানাকে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যতিক্রম বলে ধরা হয়েছে। তাঁদের মতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র যামানাও তেমনি ব্যতিক্রম। আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (রঃ) বলেন, অন্য একটি হাদীছে এ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا

ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير -

'এই দ্বীনের প্রথম অংশ হলো নবুয়ত ও রহমত। তারপর খেলাফত ও রহমত। তারপর বাদশাহী ও রহমত। তারপর আমিরী শাসন ও রহমত। এরপর লোকেরা ইমারত ও রাজত্ব নিয়ে কামড়া-কামড়ি করবে, গর্দভের মত কামড়ে ধরবে।'

আল্লামা ইবনে হাজার আঁল হায়তামী বলেন, আলোচ্য হাদীছের সকল বর্ণনাকারী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। (তাত্বহীরুল জিনান পৃঃ ৩১)

এখানে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তির পর যে শাসনযুগ আসবে তা বাদশাহী হলেও রহমতপূর্ণ। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের আমলে হবে কর্তনকারী বাদশাহীর প্রাধান্য।

অন্যত্র আল্লামা ইবনে হাজার আল হায়তামী লিখেছেন—

হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথম বাদশাহ বলে হযরত সফীনাহ (রহঃ) যে মন্তব্য করেছেন তাতে এ ভুল ধারণায় পড়া উচিত নয় যে, তাঁর খিলাফত বিশুদ্ধ ছিলো না। কেননা তার মন্তব্যের মর্ম এই যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনামল খিলাফত হলেও তাতে বাদশাহী শাসনের ছাপ ছিলো। কেননা অনেক বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত পথ ও পন্থা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে তিনি অসমর্থ হয়েছিলেন।

চার খলীফা ও হযরত ইমাম হাসানের মত হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র খিলাফতেরও বিশুদ্ধতার কারণ এই যে, হাসান (রাঃ) তাঁর অনুকূলে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁকে বাদশাহ বলার কারণ এই যে, কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে সেগুলোর উৎস ভুল ইজতিহাদ হওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনি অপরাধী নন। অবশ্য সঠিক, নির্ভুল ও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মুজতাহিদের মহান মর্যাদার তুলনায় তাঁর অবস্থান কিছুটা নীচে নেমে আসবে। (তাত্বহীরুল জিনান আলা হামিশিস ছাওয়ায়েক পৃঃ ৩১)

মোটকথা, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকালকে যারা বাদশাহী শাসন বলেন, তারা একাধিক ভুল ইজতিহাদের কারণেই তা বলে থাকেন। পক্ষান্তরে খিলাফত বলার কারণ এই যে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সরে দাঁড়ানো এবং উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বীকৃতির ফলে তিনি আনুগত্য লাভের অধিকারী নিয়মতান্ত্রিক খলীফা ছিলেন। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের উপর খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্য স্বীকৃত অধিকারসমূহ তাঁর জন্যও পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত ছিলো। কিন্তু তাঁর সকল উত্তরসূরীদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। কেননা তারা প্রয়োজনীয় ইজতেহাদী যোগ্যতার অধিকারী ছিলো না। এমনকি তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্য নাফরমানি ও পাপাচারেও লিপ্ত ছিলো। তাই কোনক্রমেই খলীফাতুল মুসলিমীনদের তালিকায় তাদের নাম অর্ন্তুক্ত হতে পারে না, বরং রাজা বাদশাহদের কাতারেই তাদের মানায় ভালো। (তাবারী খঃ ৪, পৃঃ ২৪৮)

উপরের দীর্ঘ আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলের মাঝে পার্থক্য অবশ্যই ছিলো: তবে তা ভালো ও মন্দের পার্থক্য ছিলো না; ছিলো চাঁদ ও সূর্যের, শিলা ও শিশিরের এবং নদী ও সমুদ্রের পার্থক্য। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজেও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জীবনের শেষ খোতবায় তাই তিনি এত সুন্দর করে বলতে পেরেছিলেন—

لن يأتيكم من بعدى الا من انا خير منه كما ان من قبلى كان خيرا منى -

'আমার আগের (খলীফা)গণ যেমন আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন; তেমনি আমার পরে যারা আসবে, আমি তাদের সবার চেয়ে উত্তম হবো।'

(মিনহাজুস্ সুন্নাহ খঃ ৩ পৃঃ ১৮৫)

আমরা আবার বলছি, উভয় শাসনকালের মাঝে পার্থক্য অবশ্যই ছিলো, কিন্তু তা এত বিশাল বা ভয়ঙ্কর ছিলো না যে, একদিকে হলো ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং তাকওয়া ও ধর্মভীরুতা, আর অন্যদিকে হলো অনাচার-পাপাচার এবং জুলুম-অবিচার। বরং সে পার্থক্য ছিলো শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও উদারতার, তাকওয়ার চূড়ান্ত সীমা ও বৈধতার প্রান্ত সীমার এবং নির্ভুল ইজতিহাদ ও অপেক্ষাকৃত ভুল ইজতিহাদের। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন—

فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيرا منهم فى زمن معاوية اذا نسب ايامه الى ايام من بعده واما اذا نسب الى ايام ابى بكر وعمر ظهر التفاضل -

'মুসলমান বাদশাহদের মাঝে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র চেয়ে উত্তম কেউ ছিলো না। যদি পরবর্তী যুগের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে হযরত মু'আবিয়ার আমলে মুসলমানগণ যতটা কল্যাণকর অবস্থায় ছিলো, ততটা আর কখনো ছিলো না। অবশ্য হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-র খিলাফতকালের সাথে তুলনা করলে মর্যাদাগত পার্থক্য ধরা পড়বে।

(মিনহাজুস্ সুন্নাহ খঃ ৩, পৃঃ ১৮৫)

আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের ইমামগণ উভয় শাসনকালের মাঝে যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তা যেমন ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তনধারা ও আহলে সুন্নাতের স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি তা রাসূলুল্লাহ্

ছাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং ছাহাবায় কেরামের শান ও মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে মাওলানা মওদূদী সাহেব হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকালের যে ভয়ংকর ও বিভৎস চিত্র এঁকেছেন তা ছাহাবায় কেরামের পুত-পবিত্র জীবন ও শিশির-শুভ্র চরিত্রকে যেমন কলঙ্কিত করেছে তেমনি ইতিহাসের স্বভাবধর্ম ও ক্রমবিবর্তনধারাকেও অস্বীকার করেছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় বিনয়-নম্রতার সাথে আমরা তাঁর এ অভিনব গবেষণাকর্ম প্রত্যাখ্যান করছি।

বালাকোটের অমর শহীদের দৃষ্টিতে

এবার আসুন; আমরা 'ইমামত ও খিলাফত' সম্পর্কে বালাকোটের অমর শহীদ শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ)-এর মতামত শুনি। আমাদের বিশ্বাস, এ সম্পর্কে কথা বলার ও মত প্রকাশের অধিকার ও যোগ্যতা তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো নেই। কেননা, নিরাপদ পাঠকক্ষের আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে কলম দাগার মাধ্যমেই তিনি তাঁর দায়িত্ব সাঙ্গ করেন নি। বরং মহান নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহের ডাকে ইসলামী খিলাফত পুনরুদ্ধারের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আল্লাহ্র শার্দুল এই মর্দে মুজাহিদ। এমন এক শহীদী ফৌজ তিনি গড়ে তুলেছিলেন যা কাঁপিয়ে দিয়েছিলো বৃটিশ ভারতের রাজ সিংহাসনের মজবুত বুনিয়াদ। বালাকোটের ময়দানে সেই জানকবুল মুজাহিদ ফৌজের তিনিই ছিলেন সিপাহসালার। বালাকোটের প্রতিটি বালুকণা তাঁর পাক খুনের জান্নাতী খোশবুতে আজো মোহিত।

খিলাফতে রাশেদা ও বাদশাহী শাসনের মাঝে পার্থক্য কী ? ইনসাফভিত্তিক এমন কোন বাদশাহী শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব কি সম্ভব, যা খিলাফতে রাশেদা না হয়েও ইসলামী শরীয়তের গণ্ডিতে অবস্থান করতে পারে? এ সম্পর্কে শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ) তাঁর অমর গ্রন্থ منصب امامت এ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনার আলোকে বিভিন্ন শাসনামলের স্তর বিন্যাস এবং শরীয়তনির্ধারিত আকৃতি ও প্রকৃতি আমরা জানতে পারবো। আরো জানতে পারবো খিলাফতে রাশেদার বিচারে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালের সঠিক অবস্থান। শাহ সাহেবের সে অনবদ্য আলোচনা পাঠকবর্গের খিদমতে আমরা হুবহু তুলে ধরছি—

'এমন ব্যক্তি (অর্থাৎ, খলীফায়ে রাশেদ) যখন খিলাফতের দায়িত্বে আসীন হন, তখন তিনি রাজনীতি ও শাসন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দাদের সংশোধন, কল্যাণ সাধন, নবীর প্রতিনিধিত্ব পালন এবং আল্লাহ্র 'হুকুম' আদায় ও বিধান বাস্তবায়ন প্রয়াসে নিয়োজিত হন। ব্যক্তিস্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র কামনা

তাঁর অন্তরে জাগে না এবং কারো ক্ষতি সাধনের কলঙ্কও তাঁর চরিত্র ধারণ করে না। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির স্পর্শকেও তিনি শিরক জ্ঞান করেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য হৃদয়ের নিভৃত অঞ্চলে স্থান দেয়াকে তিনি 'স্থূল' বিবেচনা করেন। আল্লাহর বান্দাদের শিক্ষা ও সংশোধন ছাড়া অন্য কিছু তাঁর বাহ্য আচরণেও প্রার্থিত নয়, অন্তর্জগতেও কাঙ্ক্ষিত নয়। রাজনীতির যে সব নিয়ম-নীতি ঈমান থেকে বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা বাদশাহী শাসনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় সেগুলো তাঁর হাতে কখনো প্রকাশ পেতে পারে না।

কিন্তু পরবর্তী স্তরের ইমাম নফসের সব ধরনের দাবী ও চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন না। পারেন না গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক থেকে নিজেকে পুরোপুরি বাঁচিয়ে রাখতে। সে কারণেই পার্থিব সম্পদ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও সমসাময়িকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার, দেশ জয়, স্বজনপ্রীতি এবং দেহ ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে (কিছু না কিছু) স্থান পেয়ে থাকে এবং রাজনীতি ও শাসনক্ষমতাকে সেগুলো অর্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করে থাকে। এভাবে শাসনক্ষমতা তাঁর কৌশলি কার্যকলাপের ফলে মনের কামনা-বাসনা পর্যন্ত পৌঁছার সোপান হয়ে দাঁড়ায়। এটাই হচ্ছে বাদশাহী শাসন। উপরোল্লেখিত দৈহিক ভোগ-বিলাস ও চাহিদা পূরণ যখন ঈমানকেন্দ্রিক শাসননীতির সাথে সংমিশ্রিত হয়, তখনই খিলাফতে রাশেদার প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে বাদশাহী শাসন প্রকট আকার ধারণ করে।

অবশ্য দেহ ও প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানোর প্রয়াস-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে পাত্রভেদে তারতম্য হতে পারে। এই প্রবৃত্তি ও পাশবিকতা কাউকে এতই কাবু করে ফেলে যে, দ্বীন ও ঈমানের গণ্ডি থেকেই তাকে বের করে দেয়। কাউকে পাপাচার ও অনাচারের সীমায় পৌঁছে দেয়। কাউকে বা আয়েশী ও বিলাসপ্রিয় করে তোলে।

ঈমানকেন্দ্রিক শাসননীতির সাথে দেহ ও প্রবৃত্তির চাহিদার সংমিশ্রণ চার স্তরে বিভক্ত বলে ধরে নিতে হবে।

প্রথম স্তর ঃ শরীয়তের বাহ্যিক আহকাম ও বিধানের পূর্ণ অনুসরণ সত্ত্বেও দৈহিক ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষী হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তের বাহ্যিক আচার আচরণের সে বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং পাপাচার-অনাচারের পথও অবলম্বন করে না। তবে আরাম আয়েশের খাতিরে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়ে সে উদার মনোভাব গ্রহণ করে। এটাকে আমরা ইনসাফপূর্ণ শাসন বলতে পারি।

দ্বিতীয় স্তর ঃ স্থূল চাহিদা ও ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য। এ পর্যায়ে

শাসক মাঝে মধ্যে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে জুলুম স্বেচ্ছাচারের সীমানায় গিয়ে উপনীত হয়। আর সে জন্য তার মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ হয় না। ফলে তাওবার পথেও অগ্রগামী হয় না, এটাকে আমরা স্বেচ্ছাচারী শাসন বলতে পারি।

তৃতীয় স্তর ঃ প্রবৃত্তির দাসত্বে নিমজ্জন। এ পর্যায়ে প্রবৃত্তি এমনই লাগামহীন হয়ে পড়ে যে, সারা জীবন সে পাপাচার ও ভোগবিলাসে ডুবে থাকে; দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে ছাড়ে; জুলুম অত্যাচারের স্থায়ী বুনিয়াদ গড়ে তোলে; বিলাস-বিনোদনের উপায়-উপকরণের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করে এবং সেটাকে নিজের গুণ ও কৃতিত্ব মনে করে। এটাকে আমরা গোমরাহী শাসন বলতে পারি।

চতুর্থ স্তর ঃ এ পর্যায়ে নিজের হাতে গড়া আইন ও শাসনতন্ত্রকে সে শরীয়তী বিধানের মোকাবেলায় উন্নত বলে দাবী করে; সুন্নাহ-প্রদর্শিত পথ ও পন্থাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিন্দা-সমালোচনা ও উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। নিজের গড়া আইন ও শাসনতন্ত্রের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তার ধারণায় ধর্ম ও শরীয়ত হলো জনগণকে প্রতারিত করার অর্থহীন বাগাড়ম্বর এবং আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূলের সুন্নাহ হলো বোকার স্বর্গ। এভাবে তার হাতে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার গোড়াপত্তন হয়। এটাকে আমরা তাগুতি ও ধর্মদ্রোহী শাসন বলতে পারি।'

অতঃপর শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ) শাসনব্যবস্থাকে 'পূর্ণাঙ্গ শাসন' ও 'অপূর্ণাঙ্গ শাসন' এ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে ইনসাফ ও শরীয়তের পথে পরিচালিত হলে তিনি পূর্ণাঙ্গ শাসক। পক্ষান্তরে তা মানুষের ভয়ে হলে তিনি অপূর্ণাঙ্গ শাসক। এই বিভক্তির আলোকে শাহ সাহেব লিখেছেন—

'সুলতানে কামিল বা পূর্ণাঙ্গ শাসক বাহ্যত খলিফায়ে রাশেদের সমতুল্য। অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার স্তরে উন্নীত না হলেও ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে খিলাফতে রাশেদার অনেক কল্যাণকর দিক তিনি অনুসরণ করে থাকেন। সুলতানে কামিল কখনো ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং সে ক্ষেত্রে খিলাফতের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন আধ্যাত্মিক ইমাম বিদ্যমান থাকলে তাঁর উচিত হবে রাজনীতি ও শাসননীতির ক্ষেত্রে সুলতানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়া এবং সেনাবাহিনী ও জনসাধারণকে জিহাদ ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। তাঁর তখনকার কর্তব্য হবে আধ্যাত্মিক ইমামের পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা এবং মানুষের হিদায়াত ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

মোটকথা, খিলাফতে রাশেদার নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার খাতিরে তাকদীরের ফায়সালা হিসাবে সেটা তাঁর মেনে নেয়া উচিত এবং জনসাধারণকেও তা মেনে নিতে উৎসাহিত করা উচিত। সিরিয়ার সুলতান হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর মোকাবেলায় হযরত ইমাম হাসান এ নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। বিভেদ ও দ্বন্দ্বের পথ উন্মুক্ত হতে তিনি দেন নি। এই মহান-সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশংসায় ইরশাদ করেছিলেন—

ان ابنی هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ـ

'আমার এ পুত্র নেতাসুলভ গুণের অধিকারী। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে সমঝোতা করাবেন।'

এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, সুলতানে কামিলের নেতৃত্বে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা আল্লাহ্ ও রাসূলের মনঃপূত কাজ এবং সুলতানে কামিলের আনুগত্য আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল আমল।

আসলে সুলতানে কামিল হলেন খিলাফতে রাশেদা ও সাধারণ সুলতানদের মাঝে এক সেতুবন্ধন। সাধারণ শাসকদের বিচারে সুলতানে কামিলকেই মনে হবে খলীফায়ে রাশেদ। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচারে তাঁকে মনে হবে সুলতানে কামিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সিরিয়ার সুলতান (হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন—

لست فيكم مثل ابی بكر وعمر ولكن ستـرون امراء من بعدی

'তোমাদের মাঝে আমি আবু বকর ও উমরের মত উত্তম শাসক নই বটে; তবে আমার পরে তোমরা দেখবে, শাসক কেমন হয়!'

এই হিসাবে তাঁর শাসনকাল নবুওয়ত ও খিলাফতে রাশেদার সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। তাই আমরা বলতে পারি: খিলাফতে রাশেদার প্রারম্ভ থেকে সুলতানে কামিলের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত হলো ইসলামের উন্নতি, পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির যুগ।'

এ হলো বালাকোটের শহীদী ফৌজের মহান সিপাহসালারের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা। আমাদের মতে খিলাফত ও বাদশাহী শাসনের পার্থক্য, স্তরতারতম্য এবং হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর শাসন সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দর ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা আর হতে পারে না।

আল্লাহ্ জানেন, মাওলানা মওদূদীর এ লেখাটি পড়ার সৌভাগ্য কখনো হয়েছি কি না। তাহলে হয়ত তাঁর কলমের অনেক বিড়ম্বনা থেকে তিনি এবং আমরা বেঁচে যেতাম।

একটি জরুরী কথা

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রথমতঃ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত প্রচারণা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনার জীবনে অকালবার্ধক্য এলো কেন?'

তিনি বললেন, 'কেন নয়? আরবের লোকেরা তো দিন-রাত আমার পিছনে লেগেই আছে। এমন সব কথা তারা ছড়িয়ে বেড়ায় যার জবাব আমাকে বাধ্য হয়েই দিতে হয়। আমার ভালো কাজগুলোর প্রশংসা করা হয় না, কিন্তু মানুষ হিসাবে কখনো ভুল করে বসলে আর রক্ষা নেই। সে খবর নিয়ে দিকে দিকে লোক ছড়িয়ে পড়ে।'

সুতরাং তাঁর বেলায় তো ঘটনা এবং বর্ণনার তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় আরো বেশী।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রচারণার কর্দমাক্ত স্রোতে একবার গা ভাসিয়ে দিলে শুধু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র মহান ব্যক্তিত্বই নয়, সকল ছাহাবার ব্যক্তিত্বই মূর্খ অর্বাচীনদের নগ্ন হামলার মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়বে। আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের আস্পর্ধা প্রদর্শনকারীরা অন্যান্য ছাহাবার ব্যাপারে আরো বেশী দুঃসাহসী হয়ে পড়ে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত রাবী বিন নাফে (রহঃ) বলেছেন—

'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হলেন রাসূলের ছাহাবাদের আবরু রক্ষাকারী আবরণ। এ আবরণ কেউ ছিন্ন করলে অন্যান্যদের বেলায়ও সে দুঃসাহসী হয়ে ওঠবে।' (আল খতিবকৃত তারীখে বাগদাদ)

ঠিক একারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারককে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কে উত্তম ? হযরত মু'আবিয়া না উমর বিন আব্দুল আযীয ? তখন তিনি সাফ জবাব দিলেন—

تراب فی انف معاوية افضل من عمر بن عبد العزيز

মু'আবিয়া (রাঃ)-র নাকের ধূলিকণাও উমর বিন আব্দুল আযীযের চেয়ে উত্তম। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৯)

অন্যদিকে হযরত ইবরাহীম বিন মায়সারাহ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীযকে কোন দিন কারো গায়ে হাত তুলতে দেখি নি। তবে হযরত মু'আবিয়ার সমালোচনার অপরাধে এক ব্যক্তিকে চাবুক লাগাতে দেখেছি।

জানি না; দ্বিতীয় উমর এ যুগে বেঁচে থাকলে তাঁর ইনসাফের চাবুক আবার ঝলসে উঠতো কি না?

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)
ব্যক্তি-চরিত্র-অবদান

প্রথম কথা

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অপরিসীম ত্যাগ ও কোরবানী এবং দান ও অবদানের কৃতজ্ঞতাবন্ধন থেকে ইসলামী উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত মুক্ত হতে পারবে না। তিনি সেই সল্পসংখ্যক ছাহাবার অন্যতম, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে সর্বক্ষণ হাজির থেকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ অহী লিপিবদ্ধ করার দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। একই সাথে তিনি ইসলামী দুনিয়ার এমন এক মজলুম ব্যক্তি, যাঁর সুমহান আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি চরম উপেক্ষাই শুধু প্রদর্শন করা হয় নি, ইসলামী উম্মাহর ইতিহাস থেকে সেগুলো বিলুপ্ত করার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টাও চালানো হয়েছে। তাঁর পুতপবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এমন সব অপবাদ রটাতেও শক্ররা দ্বিধাবোধ করে নি, যা ছাহাবী মাথায় থাকুন, সে যুগের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

ইসলামী উম্মাহর মুখোশহীন ও মুখোশধারী শক্রদের প্রচারণার ধূম্রজালে রাসূল-সান্নিধ্যে ধন্য এ মহান ছাহাবীর জান্নাতি চরিত্র আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আজ হারিয়ে গেছে সম্পূর্ণরূপে। ফলে আজকের ইসলামী দুনিয়া সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-র বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী মু'আবিয়া (রাঃ)-র কথা তো জানে, কিন্তু জানে না সেই মু'আবিয়া (রাঃ)-র কথা, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয়পাত্র। অহী লেখার দায়িত্ব পালন করে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ দু'আ ও সুসংবাদ লাভ করেছেন যিনি। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মত কঠোর আদর্শবাদী খলীফার মুখেও যিনি যোগ্য নেতৃত্ব ও শাসনদক্ষতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন এবং ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যিনি রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন।

মানুষ এ কথা তো বেশ পত্রপল্লবিত আকারেই জানে যে, হযরত মু'আবিয়ার জীবন কেটেছে যুদ্ধ-বিগ্রহে, রক্তপাত ও হানাহানিতে। কিন্তু সাইপ্রাস,

রোডেশিয়া ও সুদানের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো যিনি মুসলিম জাহানকে উপহার দিয়েছেন; বহু বছরের বিভেদ-রক্তপাতের পর গোটা ইসলামী উম্মাহকে পুনরায় এক পতাকাতলে যিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন; জিহাদের মৃতপ্রায় ফরজ যিনি ফের যিন্দা করেছেন। স্বীয় শাসনকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় অপূর্ব সাহসিকতা, অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা এবং শাসনদক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিরল ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার পুণ্য পরিচয় আজ চাপা পড়ে গেছে প্রচারণার পুরু আস্তরণের নীচে।

আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র জীবন ও চরিত্রের সেই বিস্মৃত অনুপম দিকগুলো পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। এটা তাঁর বিস্ময়কর, কর্মবহুল ও আদর্শ জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র না হলেও এর মাধ্যমে তাঁর জীবন ও চরিত্রের এমন এক মনোরম ও মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে ওঠবে, যা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী প্রতিটি মানুষকেই তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত করে তোলবে।

ইসলাম পূর্ব অবস্থা

তাঁর জন্ম হয়েছিলো আরবের অভিজাততম গোত্র কোরাইশের বনু উমাইয়া শাখায়। নেতৃত্ব, বংশ কৌলীন্য ও সামাজিক মর্যাদায় বনু হাশিমের পরই ছিলো বনু উমাইয়ার স্থান।

তাঁর পিতা হযরত আবু সুফয়ান ইসলামপূর্ব জীবনেও ছিলেন অতি উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। প্রথম সারির কোরাইশ নেতৃত্বের তিনি ছিলেন অন্যতম। মক্কা বিজয়ের বরকতময় দিনে হযরত আবু সুফয়ানের ইসলাম গ্রহণে আল্লাহ্‌র রাসূল খুবই প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আবু সুফয়ানের ঘরে যে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো।'

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সুফয়ান বেদনাদগ্ধ হৃদয়ে অনুভব করলেন যে, তাঁর জীবনের বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাই তিনি রাসূলের পবিত্র সান্নিধ্যে থেকে তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার পূর্ণ ফায়দা অর্জনে সচেষ্ট হন এবং বছরের পথ মাসে ও মাসের পথ দিনে অতিক্রম করার এক অনন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তেমন হিম্মত ও মনোবলই দিয়েছিলেন আল্লাহ্ তাঁকে। হোনায়ন যুদ্ধ ছিলো রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ গাযওয়া এবং ইসলামের পক্ষে হযরত আবু সুফয়ান (রাঃ)-র জীবনের প্রথম অস্ত্রধারণ।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর ইয়ারমুকের ঐতিহাসিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অবশেষে একত্রিশ হিজরীতে তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। রাসূলুল্লাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে দুর্জয় সাহস, সর্বজয়ী মনোবল ও চারিত্রিক আভিজাত্যের আলামত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিশোর মু'আবিয়াকে লক্ষ্য করে পিতা আবু সুফয়ান একবার বলেছিলেন—

'আমার এ ছেলে তার গোত্রের নেতা না হয়েই যায় না।'

কিন্তু হযরত আবু সুফয়ানের স্ত্রী হযরত হিন্দা (রাঃ) প্রতিবাদ করে বললেন, 'শুধু নিজ গোত্রের ? সে যদি গোটা আরবের নেতৃপদে বরিত না হয়, তাহলে বৃথাই আমার স্তন্যদান।' (আল-ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৪১৩)

কৈশোর থেকেই পিতা-মাতা তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ফলে অল্প বয়সেই জ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গোটা আরব জাতি যখন মূর্খতা ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সে সময় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন আঙ্গুলে গণা যায় এমন কয়েকজন লেখাপড়া জানা লোকের অন্যতম। ইসলামপূর্ব জীবনেও তিনি প্রশংসিত গুণ ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইবনে কাছীর লিখেছেন—

وكان رئيسا مطاعا ذا مال جزيل

স্বগোত্রে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য নেতা এবং অগাধ সম্পদের অধিকারী।

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ২১)

ইসলাম গ্রহণ

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে অনেক আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে বেশ কিছু ওজর অসুবিধার কারণে তখন তিনি তা প্রকাশ করতে অপারগ ছিলেন। ওয়াকিদীর বর্ণনামতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কার বিজয়ের দিন তা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ইসলামের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো শুরু থেকেই। এ জন্যই আমরা দেখি; বদর, অহুদ ও খন্দকের মত গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধগুলোতে তিনি অনুপস্থিত। অথচ তিনি তখন

যুদ্ধপাগল আরবের এক লড়াকু যুবক। তাঁর সমবয়সী সকলেই প্রতিটি যুদ্ধে উন্মাদনার সাথে শরীক হচ্ছিলো। সর্বোপরি সেসব যুদ্ধে পিতা আবু সুফয়ান ছিলেন কোরাইশ বাহিনীর প্রধানসেনাপতি। তা সত্ত্বেও বদর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সকল যুদ্ধ থেকে তাঁর দূরে সরে থাকা এ কথাই প্রমাণ করে যে, শুরু থেকেই ইসলামের সত্যতা তাঁর হৃদয়ের নরম মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছিলো।

দরবারে রিসালাতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফলে নবীজীর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত হয় অহী লিপিবদ্ধ করার সুমহান দায়িত্ব। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিবরীল আমীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে অহী অবতীর্ণ হতো, তা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।[১] তাই ছাহাবাদের মাহফিলে তাঁর উপাধি হলো كاتب الوحى বা অহী লিপিবদ্ধকারী। এছাড়া দরবারে রিসালাত থেকে প্রেরিত যাবতীয় চিঠিপত্র ও আদেশ-ফরমানের মুসাবিদাও তিনি তৈরী করতেন। আল্লামা ইবনে হাযম লিখেছেন—

'নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখকদের মধ্যে হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) সর্বাধিক হাজির থাকতেন। এরপর দ্বিতীয় স্থান ছিলো হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর। দিন-রাত এ দু'জন ছায়ার মত নবীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। এ ছাড়া আর কোন দায়িত্ব তাঁদের ছিলো না।' (জাওয়ামিউস সাহীহ পৃঃ ২৭)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় অহী লিপিবদ্ধ করার কাজ কেমন নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং সে জন্য কতটা নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ, আমানত ও বিশ্বস্ততা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিলো, আশা করি তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সার্বক্ষণিক সেবা ও দায়িত্বপূর্ণ খিদমত এবং অতুলনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিভিন্ন গুণ ও যোগ্যতার কারণে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি প্রিয়পাত্র। ফলে নবীজীর যে পরিমাণ দু'আ ও স্নেহ তিনি লাভ করেছেন, খুব কম ছাহাবীরই সে

---

১. আন-নুজুমুয-যাহিরাহ ফি মুলুকি মিছর ওয়াল কাহিরাহ খঃ ৪ পৃঃ ১৪৫, মাজমউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ খঃ ৮ পৃঃ ২১, আল-বিদায়া খঃ ৯ পৃঃ ৩৫৭, আল ইসতিআব তাহতাল ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৪৫)

সৌভাগ্য হয়েছিলো। তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী একবার তাঁকে এভাবে দু'আ দিয়েছেন—

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به

হে আল্লাহ্! তাঁকে পথপ্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত করে দাও এবং তার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান করো। (জাওয়ামিউস সাহীহ খঃ ২ পৃঃ ২৪৭)

অন্য হাদীছে ইরশাদ হয়েছে—

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

হে আল্লাহ্! মু'আবিয়াকে হিসাব ও কিতাবের জ্ঞান দান করো এবং (জাহান্নামের) আযাব থেকে তাকে রক্ষা করো। (উসদুল গাবাহ খঃ ৪ পৃঃ ৩৮৬)

অদূর ভবিষ্যতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র হাতে যে ইসলামী উম্মাহ্র দায়িত্বভার অর্পিত হবে সে সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন—

'একবার আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অযুর পানি নিয়ে গেলাম। সে পানি দিয়ে তিনি অযু করলেন এবং অযুর পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মু'আবিয়া! তোমার হাতে যদি শাসনক্ষমতা অর্পিত হয় তাহলে তখন তুমি আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে এবং ইনসাফ কায়েম করবে।'

হাদীছ বর্ণনার পর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের কারণে আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো যে, অবশ্যই আমি এ পরীক্ষার সম্মুখীন হবো। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।'

(আল-ইছাবাহ পৃঃ ৪১৩)

দরবারে রিসালাতে হযরত মু'আবিয়ার (রাঃ)-র কি পরিমাণ মর্যাদা ছিলো, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি তাঁর ইখলাস ও ভালোবাসা কত গভীর ছিলো এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রাসূলের স্নেহ ও সন্তুষ্টিই বা কি পরিমাণ ছিলো তা উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েতগুলো থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে তো এমনও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে কোন পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের পরামর্শ সন্তোষজন হলো না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

ادعوا معاوية احضروه امركم فانه قوى امين -

মু'আবিয়াকে ডেকে বিষয়টি তার সামনে পেশ করো। কেননা সে (পরামর্শ দানে) সক্ষম এবং (পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে) বিশ্বস্ত। (মাজমাউয যাওয়াইদ খঃ ৯ পৃঃ ৩৫৬, অবশ্য হাদীছটির সনদ ও সূত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আপত্তি রয়েছে।)

আল্লামা হাফেজ যাহাবীও অনুরূপ এক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে একবার সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মু'আবিয়া! তোমার দেহের কোন্ অংশ আমার দেহের সাথে মিশে আছে?'

তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পেট (ও বুক) আপনার পবিত্র দেহের সাথে মিশে আছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'আ দিয়ে বললেন—

اللهم املاه علما

হে আল্লাহ্! সেটাকে ইলম দ্বারা পূর্ণ করে দাও। (তারিখুল ইসলাম খঃ ২ পৃঃ ৩১৯)

ছাহাবাদের দৃষ্টিতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

দোজাহানের সরদার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র সম্পর্ক কী গভীর, পবিত্র ও প্রেমময় ছিলো এবং দরবারে রিসালাতে তিনি কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন সে সম্পর্কে উপরের হাদীছগুলো থেকে আমরা কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করেছি। এবার আসুন দেখি; ছাহাবা কেরামের মাঝে তাঁর আদর-কদর ও মর্যাদা-সমাদর কেমন ছিলো।

আল ইসতী'আব-এর বর্ণনা মতে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-র উপস্থিতিতে একবার হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—

دعونا من ذم فتى من قريش يضحك فى الغضب ولاينال ما عنده الا على الرضى ولايؤخذ ما فوق رأسه الا من تحت قدميه ـ

যে কোরাইশী যুবক চরম ক্রোধের মুহূর্তেও হাসতে পারে, যার হাত থেকে স্বেচ্ছায় না দিলে কিছু ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং যার শিরস্ত্রাণ পেতে হলে পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। (অর্থাৎ সহনশীলতা, সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধে যে যুবক অতুলনীয়) তোমরা তারই সমালোচনা করছো!

(আল ইসতী'আব খঃ ৩ পৃ ৩৭৭)

আরেকবার হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

'লোকসকল! আমার পরে তোমরা দলাদলি ও কোন্দল এড়িয়ে চলবে। যদি তা না করো তবে মনে রেখো; সিরিয়ায় কিন্তু মু'আবিয়া রয়েছে। সে তোমাদের অবশ্যই সায়েস্তা করবে।" (আল ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৪১৪)

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা কম আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয় না। কেননা একদিকে তা যেমন বড়দের সামনে হযরত মু'আবিয়া

(রাঃ)-র স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও কৃতার্থ মনোভাবের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি তা অধীনস্থ ও নিকটজনদের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)-র সদা সতর্ক দৃষ্টির জ্বলন্ত নজির।

আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার আকর্ষণীয় সবুজ পোশাকে হযরত ওমর (রাঃ)-র খেদমতে হাজির হলেন। উপস্থিত সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াতেই হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে তাঁকে চাবকাতে শুরু করলেন। আর হযরত মু'আবিয়া আর্তস্বরে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্! আল্লাহ্! আমায় মারছেন কেন আমীরুল মুমিনীন?

কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রাঃ) স্বস্থানে ফিরে এসে বসে পড়লেন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার প্রশাসকদের মাঝে এই কোরাইশী যুবকের চেয়ে ভালো তো কেউ নেই; তবু যে আপনি এঁকে মারলেন?'

জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'এটা ঠিক যে এ যুবকের চরিত্রে ভালো ছাড়া মন্দ কখনো আমি দেখি নি এবং এর সম্পর্কে সব সময় ভালো সংবাদই পেয়ে এসেছি। তবে কিনা সবুজ পোশাকটা এর গা থেকে আমি নামাতে চাচ্ছিলাম।' (আল ইছাবাহ, খঃ ৩ পৃঃ ৪১৪)

হযরত ওমর (রাঃ)-র দৃষ্টিতে যোগ্যতা ও মর্যাদার কোন্ শীর্ষ সোপানে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অবস্থান ছিলো তা পরিষ্কাররূপে আমরা জানতে পারি, হযরত মু'আবিয়ার ভাই যায়দ বিন আবু সুফয়ানের ইন্তিকালের পর তাঁকে সিরিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করার ঘটনা থেকে। লোকনির্বাচন ও প্রশাসক নিযুক্তির ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-র ঈমানী প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কথা গোটা দুনিয়া জানে। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আগাগোড়া নিশ্চিত ও আশ্বস্ত না হয়ে তাঁকে তিনি কোন অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করতেন না। এমনকি নিযুক্তির পরও তাঁর সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নিতে থাকতেন এবং কারো মধ্যে সামান্য বিচ্যুতি কিংবা অসতর্কতা লক্ষ্য করামাত্র তাঁকে বরখাস্ত করে দিতেন। রোমকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে 'আল্লাহ্র তরবারি' হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে পর্যন্ত সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। কেননা হযরত খালিদের সমর কৌশলের উপর মুসলিম ফৌজের আস্থা ও ভরসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। আর হযরত ওমরের দৃষ্টিতে এটা ছিলো আল্লাহ্র সাহায্যের উপর নিরঙ্কুশ নির্ভরতার

পরিপন্থী। সেই হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে সিরিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বপদে বহাল রেখেছেন তখন নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।

পরবর্তী খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-র মর্মান্তিক শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট অংশ হযরত আলী (রাঃ)-র হাতে বাই'আত হলো। ফলে তিনি শরীয়তসম্মত চতুর্থ খলীফা মনোনীত হলেন। ঘটনাপ্রবাহের এই নাযুক মুহূর্তে এসে উসমান-হত্যাকারীদের কিসাস ও বিচার দাবীকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রাঃ)-র সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হলো, পরবর্তী পর্যায়ে যা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিয়ে গোটা উম্মাহকে যুদ্ধমান দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছিলো। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামী উম্মাহর কল্যাণ সাধন। তাই উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষের ইখলাস ও আন্তরিকতা, তাকওয়া ও ধার্মিকতা, চারিত্রিক মহত্ত্ব ও উন্নত নৈতিকতা এবং দ্বীন ও ঈমানের প্রতি বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি দিতেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীর বর্ণনা করেছেন, সিফফীন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আপন অনুগামীদের লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন—

ايها الناس لاتكرهوا امارة معاوية فانكم لو فقدتموه رايتم الرؤوس تندر عن كواهلها كانما الحنظل ـ

হে লোকসকল! মু'আবিয়ার শাসনকে তোমরা না-পছন্দ করো না। কেননা তাকে যেদিন হারাবে সেদিন দেখবে, ধড় থেকে মুণ্ডগুলো হানযাল ফলের মত কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩১)

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবা হযরত মু'আবিয়াকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, এবার তাও লক্ষ্য করুন। রঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার ফিকাহসংক্রান্ত বিষয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র সমালোচনাকারীকে সাবধান করে বলেছিলেন, 'তিনি একজন ফকীহ' (সুতরাং তার সমালোচনার অধিকার তোমার নেই।) (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ৩১)

অন্য রিওয়ায়েত মোতাবেক সমালোচনাকারীকে তিনি আরো বলেছিলেন—

انه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য-সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (অর্থাৎ তিনি একজন ছাহাবী; সুতরাং কোন্ অধিকারে তুমি তাঁর সমালোচনা করছো?) (আল-ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৪১২, বুখারী খঃ ১ পৃঃ ৫৩১)

হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছাহাবীর কোন আচরণ বা উচ্চারণের সমালোচনা করার অধিকার সে যুগেও কারো ছিল না, সুতরাং এ যুগেও কারো নেই।

আরেক সমালোচনাকারীকে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন—

اصاب اى بنى ليس احد منا اعلم من معاوية ـ

"বৎস! তিনি ঠিকই করেছেন, মু'আবিয়ার চেয়ে জ্ঞানী আমাদের মাঝে কেউ নেই।" (বায়হাকী খঃ ৩ পৃঃ ২৬)

দেখুন; হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তাকওয়া ও ধার্মিকতা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন! এমন কি রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো-

مارأيت اخلق للملك من معاوية

শাসনক্ষমতার জন্য মু'আবিয়ার চেয়ে উপযুক্ত কেউ আমার নজরে পড়ে নি।

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৫)

হযরত ওমায়র বিন সা'আদ (রাঃ)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিরমিযি শরীফের বর্ণনা মতে হযরত ওমায়র বিন সা'আদ (রাঃ) হিম্‌স এর প্রশাসক থাকা অবস্থায় কোন কারণে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে সরিয়ে হযরত মু'আবিয়াকে সেখানে পাঠালেন। এতে কিছু লোকের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। হযরত ওমায়র বিন সা'আদ (রাঃ) তখন সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—

দেখো; মু'আবিয়া সম্পর্কে উত্তম আলোচনাই শুধু করবে। কেননা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এরূপ দু'আ করতে শুনেছি, হে আল্লাহ্! মু'আবিয়ার মাধ্যমে লোকদের হিদায়েত দান করো।

(আল-বিদায়া খঃ ২ পৃঃ ২৪৭)

কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়ী বীর, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবার অন্যতম হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) আলী-মু'আবিয়া বিরোধকালে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন। কেননা উভয় তরফের যুক্তি ও অবস্থান এত

মজবুত ছিলো যে, তাঁর মত অনেক ছাহাবীর পক্ষেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি বলতেন—

'হযরত উসমানের পর মু'আবিয়ার চেয়ে উত্তম ন্যায়বিচারক আমার নজরে পড়ে নি।'

হযরত কাবীসাহ বিন জাবির (রাঃ) বলেন—

এ দু'চোখে আমি মু'আবিয়ার চেয়ে উদার, সহনশীল ও নেতৃত্বের যোগ্য কাউকে দেখি নি।

তাবেয়ীদের চোখে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

তাবেয়ীন তথা দ্বিতীয় কল্যাণযুগের মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অবস্থান ও মর্যাদা কী ছিলো, তা উপলব্ধি করার জন্য এই একটি ঘটনাই আশা করি যথেষ্ট হবে। সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম বিন মায়সারাহ বলেন—

"হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযকে আমি কখনো কাউকে দোররা লাগাতে দেখি নি। তবে হযরত মু'আবিয়ার সমালোচনার অপরাধে এক ব্যক্তিকে দোররা লাগাতে দেখেছি।" (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৯)

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন—

'সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মোবারককে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বললেন, 'বাহ! এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কী মন্তব্য করতে পারি, যিনি দোজাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাজ পড়েছেন এবং তাঁর سمع الله لمن حمده এর জবাবে ربنا ولك الحمد বলেছেন![১]'

তাঁকেই আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তম কে? হযরত মু'আবিয়া না হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয?

প্রশ্নকারী একদিকে সেই ছাহাবীকে রেখেছেন, যাঁর বিরুদ্ধে ইতিহাসের আদালতে রয়েছে জঘন্যতম সব অভিযোগ। অন্যদিকে রেখেছেন খিলাফতে রাশেদার প্রতিবিম্ব সেই মহান তাবেয়ীকে, উম্মাহর প্রতিটি সদস্য যাঁর মর্যাদা ও

১. সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা— আল্লাহ্ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শোনেন। রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ— হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য হাম্‌দ ও প্রশংসা। —হযরত ইবনুল মোবারকের বক্তব্যের অর্থ হল, রাসূলের উৎসাহ প্রদানে উৎসাহিত হয়ে যিনি আল্লাহ্‌র হামদ করলেন তিনি তো আল্লাহ্‌র দরবারে মাকবুল হয়ে গেলেন।

শ্রেষ্ঠত্বের সামনে শ্রদ্ধাবনত। কিন্তু প্রশ্ন শোনামাত্র স্বভাবসংযমী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মোবারক ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁকে এতটা ক্রুদ্ধ হতে কেউ কখনো দেখে নি। তিনি বললেন, হযরত মু'আবিয়ার সাথে তুমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের তুলনা করছো? আল্লাহ্‌র কসম! নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে গিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র নাকের ছিদ্রপথে যে ধূলোবালি প্রবেশ করেছে সেগুলোও ওমর বিন আব্দুল আযীযের তুলনায় হাজার গুণে উত্তম।

একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিলো হযরত মু'আফা বিন ইমরানকে। তিনিও রাগত স্বরে প্রশ্নকারীকে জবাব দিয়েছিলেন, 'আশ্চর্য! একজন তাবেয়ী কোন ছাহাবীর চেয়ে উত্তম হতে পারেন কি করে? তদুপরি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হলেন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট ছাহাবাদের একজন। তাঁর বোন হলেন নবীর স্ত্রী এবং মুমিনদের মা। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ অহী লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। সুতরাং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে স্বর্ণশিখরে তিনি সমাসীন, কোন তাবেয়ীর পক্ষে তা কল্পনা করাই বা সম্ভব কিভাবে? তারপর প্রশ্নকারীকে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ শুনিয়ে দিলেন—

'আমার ছাহাবা ও আহলে বায়তকে যারা গালমন্দ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৯)

সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আহনাফ বিন কায়সের ধৈর্য ও সহনশীলতার খ্যাতি ছিলো আরব-জোড়া। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ধৈর্য ও সহনশীলতায় শ্রেষ্ঠ কে? আপনি না মু'আবিয়া?

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মত মূর্খ দ্বিতীয়টি আমার নজরে পড়ে নি। হযরত মু'আবিয়ার ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিলো ক্ষমতার মসনদে থেকে, আর আমারটা হলো মাটির বিছানায় বসে। বলো, এ দুয়ে বরাবর হয় কিভাবে?'

(তাবারী খঃ ৬ পৃঃ ১৮৭)

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

এ কথা আমরা আগেই বলেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের শুভ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর তিনি সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ্র' মোবারক কাজে নিয়োজিত হন এবং ভণ্ড মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে কাছীরের মতে, মুসায়লামা-হত্যার গৌরবময় অবদানে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত ওয়াহ্শী (রাঃ)-র সহযোগী ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-র খিলাফতকালে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র ভাই হযরত যায়দ বিন আবু সুফয়ান (রাঃ) সিরিয়ার প্রশাসক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯ হিজরীতে হযরত ওমর (রাঃ) যায়দ বিন আবু সুফয়ান (রাঃ)-কে রোমকদের গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনী কায়সারিয়া অভিমুখে অভিযানের নির্দেশ দেন। যায়দ বিন আবু সুফয়ান কায়সারিয়া অবরোধ করেন। কিন্তু অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি দামেস্কে ফিরে আসেন। এদিকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) অবরোধ অব্যাহত রেখে ১৯ হিজরীর শাওয়াল মাসে কায়সারিয়া দখল করে নেন।

এরপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে সিরিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। বাইতুল মাল থেকে তাঁর মাসিক ভাতা নির্ধারিত হয় এক হাজার দিরহাম।

হযরত ওমর (রাঃ)-র খিলাফতকালে চার বছরের প্রশাসক জীবনে তিনি রোম সীমান্তে জিহাদ অব্যাহত রেখে অসংখ্য শহর ও জনপদ জয় করেন। তাঁর এই নিরলস জিহাদের ফলে আল্লাহ্র লাখো বান্দা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। (আল-ইসতী'আব তাহতাল ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬)

হযরত উসমান (রাঃ)-র খিলাফতকাল ছিলো বার বছর। এ দীর্ঘ সময় হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর পূর্বদায়িত্বে বহাল থেকে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন বুলন্দ করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। ২৫ হিজরীতে তিনি রোম সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডে জিহাদ পরিচালনা করে আমুরিয়ায় উপনীত হন এবং পথিমধ্যে মজবুত সামরিক ছাউনী প্রতিষ্ঠা করেন।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৌন্দর্যের লীলাভূমি চিরসবুজ সাইপ্রাস দ্বীপটির গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। কেননা রোম ও ইউরোপের দিক থেকে মিসর ও সিরিয়া বিজয়ের জন্য এটা ছিলো প্রবেশদ্বার। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-অবস্থানের উপর দখল প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে মিশর ও সিরিয়ার ইসলামী ভূমি কখনোই নিরাপদ নয়, তা উপলব্ধি করতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র ন্যায় বিচক্ষণ সমরবিদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) সামুদ্রিক প্রতিকূলতাসহ বিভিন্ন কারণে তাঁকে সাইপ্রাস অভিযানের অনুমতি দেন নি। পরে হযরত উসমান (রাঃ) পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে অনুমতি প্রদান করেন।

এভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ইসলামী উম্মাহর ইতিহাসের প্রথম নৌবহর নিয়ে সাইপ্রাস অভিযানে রওয়ানা হন। এ ঐতিহাসিক অভিযানে ছাহাবাদের এক মোবারক জামাতও তাঁর সাথে ছিলেন। (তারীখে ইবনে খালদুন খঃ ৬ পৃঃ ৪১০)

আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেছেন—

"হযরত মু'আবিয়াই হলেন প্রথম খলীফা, যিনি ইসলামী ফৌজের জন্য নৌবহর তৈরী করে মুসলমানদের মধ্যে নৌযুদ্ধের গোড়াপত্তন করেন।"

(মুকাদ্দমা ইবনে খালদুন পৃঃ ৪৫৩)

ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি অন্যদিক থেকেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র জীবনে সাইপ্রাস অভিযান ছিলো সৌভাগ্যের স্বর্ণসোপান। কেননা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম নৌ-অভিযাত্রীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ করেছেন—

اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا

আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী সমুদ্র অভিযানে অংশ নেবে তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। (বুখারী খঃ ১ পৃঃ ৪১০)

সাতাশ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অভিযানে রওয়ানা হন এবং এক বছরের কম সময়ে সেখানে ইসলামী ফৌজের বিজয় চূড়ান্ত করে ২৮ হিজরীতে সিরিয়া ফিরে আসেন। (আননুজূমুয্যাহিরাহ খঃ ১ পৃঃ ৮৫)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-র শাহাদাতের পর সিফ্‌ফীন ও জামাল যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলো। এ ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অবস্থান ও বক্তব্য ছিলো এই যে, ইসলামী উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) অত্যন্ত নির্মমভাবে মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। সুতরাং ঘাতকদের কিসাস ও প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য কিংবা নমনীয়তা প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই; অথচ বাস্তবে তা-ই হচ্ছে। উসমান-হত্যাকারীরা রাজধানীতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জেঁকে বসছে। এমনকি খিলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা নাক গলাতে শুরু করেছে। এসব অপতৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আল বিদায়ার একটি বর্ণনা হযরত মু'আবিয়ার নীতি ও অবস্থানের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করছে। আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন—

'(হযরত আলী (রাঃ)-র সাথে মতবিরোধ চলাকালে) হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) একদল লোক নিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র কাছে গেলেন। (উদ্দেশ্য, হযরত আলীর হাতে বাই'আত গ্রহণে তাঁকে সম্মত করা।) এবং বললেন, 'কোন্ যুক্তিতে তুমি আলীর মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছো? নিজেকে তুমি কি তাঁর সমতুল্য মনে করো?'

উত্তরে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভালো করেই জানি যে, খিলাফতের জন্য তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু উসমান মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন এটা কি সত্য নয়? আর চাচাত ভাই হিসাবে আমি কি তাঁর কিসাস দাবী করার অধিকারী নই এবং আমার অধিকারই কি সর্বাধিক নয়? আলীকে তোমরা আমার এ প্রস্তাব পৌঁছে দাও—

'উসমান-হত্যাকারীদের বিচার করুন; খিলাফত আমি আপনার হাতে অর্পণ করবো।'

কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) (উদ্ভূত পরিস্থিতি ও বাস্তবতার কারণে) উসমান-হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিক বিচার অনুষ্ঠানে সম্মত হলেন না। ফলে সিরিয়ার অধিবাসীরা হযরত মু'আবিয়ার পক্ষে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো।'

বিবেকের অপমৃত্যু এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে নি এমন যে কেউ আলোচ্য ঘটনার আলোকে নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন যে, ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ কিংবা

ক্ষমতার মোহ রাসূল-ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অন্তরে ছিলো না, বরং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর কল্যাণ এবং খিলাফতের ভাব-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিলো তাঁর আন্তরিক উদ্দেশ্য।

আমাদের দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম মুহূর্তে রোম সম্রাটকে লেখা হযরত মু'আবিয়ার ঈমান-উদ্দীপক ঐতিহাসিক পত্রটি খুবই সহায়ক হবে।

ইসলামী উম্মাহর এ দুঃখজনক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সুযোগে রোম-সম্রাটের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সিরিয়ার সীমান্ত পানে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি অতি সংগোপনে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে মেতে উঠলেন। সংবাদ পেয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রোম-সম্রাটের নামে এই চরম হুঁশিয়ারি লিখে পাঠালেন—

'আমি জানতে পেরেছি যে তুমি আমাদের সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের মতলব আঁটছো। কিন্তু কান খুলে শুনে রাখো; তখন আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমার ভাইয়ের সাথে সন্ধিতে উপনীত হবো। তারপর তোমার বিরুদ্ধে যে বাহিনী তিনি পাঠাবেন তার প্রথম কাতারে শামিল হয়ে আমি কনস্টান্টিনোপলকে ছাই-ভস্মে পরিণত করে ছাড়বো। সুতরাং পত্রপাঠ তুমি বিলকুল ভালো মানুষ বনে যাও।'[1]

হযরত মু'আবিয়ার পরামর্শমত রোমসম্রাট অবশ্য পত্রপাঠ ভালো মানুষ বনে গিয়েছিলেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুফরের মোকাবেলায় এ জাতি এখনো এক দেহ, অভিন্ন প্রাণ এবং তাদের অন্তর্বিরোধ সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ও কূটপণ্ডিতদের অন্তর্বিরোধ নয়।

বস্তুতঃ এ দুঃখজনক দ্বিধা-বিভক্তি ও মর্মান্তিক অন্তর্বিরোধের পিছনে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর মুখোশধারী শত্রুদের কালো হাতই অধিক কাজ করছিলো। পর্দার আড়ালে তারা উভয় পক্ষে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দানের কর্মটি সুকৌশলে করে যাচ্ছিলো। ফলে সন্ধি ও সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা একে একে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিলো।

৩৭ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবা ও তাবেয়ীনসহ মোট সত্তর হাজার যোদ্ধা। এ যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিলো প্রায় পাঁচ বছর।

ইতিমধ্যে সাবাঈ চক্রের গুপ্ত ঘাতকের হাতে হযরত আলী (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন। অন্যদিকে একই ধরনের হামলায় হযরত

---

১. (তাজুল উরূস, মাদ্দাহ ইস্তফিলীন খঃ ৭ পৃঃ ২০৮)

মু'আবিয়া (রাঃ) মামুলি যখমসহ অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

হযরত আলী (রাঃ)-র শাহাদাতের পর তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন সমঝোতাবাদী। মুসলমানদের পারস্পরিক হানাহানি ও রক্তপাতে তাঁর কোমল হৃদয় ছিলো ক্ষতবিক্ষত। তাই মুখোশধারী দুষ্কৃতিকারীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও হযরত মু'আবিয়ার অনুকূলে তিনি খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেন। হযরত মু'আবিয়া তাঁর জন্য বার্ষিক এক লাখ দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করলেন। সে অর্থ তিনি এতিম, বিধবা ও যুদ্ধাহতদের কল্যাণে ব্যয় করতেন।

সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রাঃ) এ সন্ধি-ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

'হযরত হাসান (রাঃ) পাহাড়সম অটল এক বাহিনী নিয়ে হযরত মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন। তা দেখে হযরত আমর বিন আছ (রাঃ) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে বললেন, আমাদের মোকাবেলায় এমন বাহিনী নেমেছে যারা সর্বনাশা যুদ্ধ না করে ফিরে যাবে না। হযরত মু'আবিয়া বলতে লাগলেন—

বলো দেখি; এরা ওদেরকে, আর ওরা এদেরকে এভাবে হত্যা করতে থাকলে এ উম্মাহর দায়িত্ব সামাল দেয়ার কাজে কে আমাকে সহায়তা করবে? মুসলিম অবলাদের রক্ষণাবেক্ষণে কে আমাকে সাহায্য করবে? তাদের এতিমদের ও সহায়সম্পদের হিফাজত-কাজেই বা কে আমার পাশে দাঁড়াবে?

(বুখারী খঃ ১ পৃঃ ৩৭২-৭৩)

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে জাতি ও মিল্লাতের প্রতি কী অপরিসীম দরদ-ব্যথা ছিলো এবং উম্মাহর এই সর্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের অবসানের জন্য তিনি কেমন অস্থির ছিলেন তা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তদুপরি আল্লামা ইবনে খালদুনের মতে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ)-র সাথে সন্ধি স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাদা কাগজে সরকারী সিল-দস্তখতসহ হযরত হাসানের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন—

'এই সাদা কাগজের নীচে আমার দস্তখত ও মোহর রয়েছে। নিজের ইচ্ছামত যে কোন শর্ত তাতে লিখে দিন, আমি তা আগাম মঞ্জুর করে নিলাম।'

(মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন পৃঃ ৪৭৫)

হযরত মু'আবিয়ার এ আচরণে হযরত হাসান (রাঃ) অভিভূত হয়ে সন্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পূর্বশর্ত লিখে পাঠালেন। এভাবে ৪১ হিজরীতে উভয়ের

মাঝে বহু কাঙ্ক্ষিত সন্ধি স্থাপিত হলো এবং ইসলামী উম্মাহ আবার একক খলীফার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হলো। এ জন্যই ইসলামের ইতিহাসে ৪১ হিজরী عام الجماعة বা ঐক্য-বর্ষ নামে আখ্যা লাভ করেছে।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে আমীরুল মুমিনীন মনোনীত হওয়ার পর মৃতপ্রায় জিহাদের মোবারক আমল নতুন উদ্যম ও নতুন প্রাণ পেলো। রোমকদের বিরুদ্ধে তিনি একে একে ষোলটি যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে গোটা ফৌজকে তিনি শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাহিনীতে ঢেলে সাজিয়ে উভয় বাহিনীর জন্য মৌসুমী যুদ্ধের উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সমর কৌশলের কারণে সারা বছরই রণাঙ্গণে তাজাদম সৈন্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিলো। ইসলামী উম্মাহর প্রতি তাঁর শেষ উপদেশ ছিলো—

شدوا خناق الروم

রোমকদের টুটি চেপে ধরো। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১২৭)

৪৯ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কনস্টান্টিনোপোলের পথে সুফয়ান বিন আওয়াফের পরিচালনায় এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। বহু বিশিষ্ট ছাহাবা তাতে শরীক ছিলেন। এ বাহিনী সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র রাসূল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

اول جيش يغزون القسطنطنية مغفورلهم

প্রথম যে বাহিনী কনস্টান্টিনোপোলের জিহাদে যাবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১২৮)

তাঁর খিলাফত আমলেই সম্পদসমৃদ্ধ সিসিলী দ্বীপপুঞ্জ মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। সেই সাথে সিজিস্তান থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডসহ সুদানের গোটা অঞ্চলে ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়।

নীচে আমরা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনামলে পরিচালিত জিহাদগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ষপঞ্জী পেশ করছি। বলাবাহুল্য যে, সিফ্‌ফীন পরবর্তী জিহাদগুলোই শুধু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রাঃ)-র খিলাফতকালের দীর্ঘ ষোল বছর সিরিয়ার প্রাশাসক থাকাকালে রোমক খৃস্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদগুলো এখানে উল্লেখ করা হয় নি।

সন	**জিহাদ**
২৭ হিজরী	নৌবহরযোগে সাইপ্রাস অভিযান। ইসলামী উম্মাহর

	ইতিহাসে এটা ছিলো প্রথম নৌযুদ্ধ।
২৮ হিজরী	সাইপ্রাস বিজয়।
৩২ হিজরী	কনস্টান্টিনোপোলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে (প্রস্তুতি-মূলক) জিহাদ পরিচালনা।
৩৩ হিজরী	বেশ কিছু রোমক দুর্গ দখল।
৩৫ হিজরী	'যীখশব' যুদ্ধ পরিচালনা।
৪২ হিজরী	সিস্তান যুদ্ধ এবং সিন্ধুর অংশবিশেষ দখল।
৪৩ হিজরী	সুদান বিজয় এবং সিস্তানের নতুন অঞ্চল দখল।
৪৪ হিজরী	কাবুল বিজয় এবং হিন্দুস্তানের ভূখণ্ডে মুসলিম ফৌজের প্রবেশ।
৪৫ হিজরী	আফ্রিকা অভিযান এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইসলামী খিলাফতের মানচিত্রে সংযোজন।
৪৬ হিজরী	সিসিলী অভিযান।
৪৭ হিজরী	আফ্রিকার নতুন নতুন এলাকা দখল।
৫০/৫১ হিজরী	কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধ। এটাই ছিলো কনস্টান্টিনোপলের উপর মুসলিম ফৌজের প্রথম আক্রমণ।
৫৪ হিজরী	আমু দরিয়া অতিক্রম করে মুসলিম ফৌজের বোখারায় প্রবেশ।
৫৬ হিজরী	সমরকন্দ যুদ্ধ। (আল 'ইবার ফী খবরে মান গাবার ও অন্যান্য।)

শাসক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)

সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনামলে মুসলিম উম্মাহর শক্তি ও গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। হযরত উসমান (রাঃ)-র খিলাফতের শেষ দিক থেকেই গৃহবিবাদ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে ইসলামী উম্মাহর জিহাদ ও বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলো। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকালে জিহাদের সেই মৃতপ্রায় আমল পুনরুজ্জীবিত হয় এবং মুসলিম ফৌজের অব্যাহত বিজয় যাত্রা শত্রু শিবিরে নতুন করে ত্রাস সৃষ্টি করে।

হযরত উসমান (রাঃ)-র খিলাফতকালেই সিরিয়ার প্রশাসক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ইসলামী উম্মাহর প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন কায়স হারেসী ছিলেন নৌবহরপ্রধান। খিলাফত লাভের পর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নৌশক্তির মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ফলে মিসর ও সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এক হাজার সাতশ বৃহদায়তন ও মজবুত জাহাজের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক বিরাট নৌবহর; যা রোমকদের মোকাবেলায় থাকতো সদা প্রস্তুত। জানাদাহ বিন উমাইয়াহ ছিলেন নৌবাহিনীপ্রধান। এ বিরাট নৌবহরের সাহায্যেই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস ও রোডেশিয়াসহ বিভিন্ন গ্রীক দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করেন। কনস্টান্টিনোপল অভিযানেও তিনি নৌবহরের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-র আমলেই ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সেটির পুনর্বিন্যাস, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বিশাল ইসলামী খিলাফতের সর্বত্র তিনি ডাক-বিভাগের জাল বিছিয়ে দেন। ফলে দ্রুততম সময়ে খিলাফতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ রাজধানীতে এসে পৌঁছতো।

এছাড়া খেলাফতের জরুরী বিষয়সমূহের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সিলমোহর বিভাগ নামে নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাইতুল্লাহ্‌র খিদমতের জন্য তিনি স্থায়ী সেবক নিযুক্ত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য মূল্যবান রেশমী কাপড়ের গেলাফ তৈরীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর তিনি খিলাফতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ সুদীর্ঘ শাসনকালের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর মন্তব্য টেনে বলেন—

'তাঁর শাসনামলে জিহাদের ধারা অব্যাহত ছিলো। আল্লাহ্‌র দ্বীন অপ্রতিহত গতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছিলো এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গনীমতলব্ধ সম্পদের ঢল নেমে আসছিলো। মোটকথা; তাঁর শাসন-ছায়ায় মুসলমানগণ সুখ-শান্তি এবং ইনসাফ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলো।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃ ১২৭)

জনসাধারণের মনোরঞ্জন, অধিকার ও প্রাপ্য আদায়, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবার অন্যতম হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হযরত মু'আবিয়ার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছেন—

"হযরত উসমানের পর এই ঘরের বাসিন্দার চেয়ে অধিক ইনসাফকারী কাউকে আমি দেখি নি।" (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৪৫)

হযরত আবু ইসহাক সাবাই (রহঃ) বলেন—

'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনকাল যদি দেখতে তাহলে ন্যায় ও ইনসাফের কারণে নিঃসন্দেহে তাঁকে তোমরা মাহদী নামে আখ্যায়িত করতে।'

হযরত মুজাহিদ (রঃ)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৪৫)

ইমাম আ'মাশের মজলিসে একবার হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন—

'তোমরা ওমর বিন আব্দুল আযীযের প্রশংসা করছো! হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনযুগ দেখলে তবে কি করতে! লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি তাঁর সহনশীলতার কথা বলছেন ? তিনি বললেন, না, তাঁর ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের কথাই বলছি।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৪৫)

সর্বদিক থেকেই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র শাসনযুগ ছিলো খিলাফতে রাশেদা-পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসের সফলতম যুগ। উম্মাহর সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে ছিলো অখণ্ড সুখ-শান্তি, সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি। জনসাধারণের জীবনযাত্রা, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর তাঁর ছিলো সদা সতর্ক দৃষ্টি। যে সকল জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর একটি এই যে, প্রত্যেক গোত্র ও বস্তিতে তিনি লোক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিলো প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে এলাকার লোকদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং বস্তির কোন ঘরে নতুন শিশুর জন্ম হলে বাইতুল মালকে তা অবহিত করা। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বাইতুল মাল থেকে নতুন ভাতা মঞ্জুর হতো।

(মিনহাজুস সুন্নাহ খঃ ৩ পৃঃ ১৮৯)

ইমাম বুখারী (রহ) আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে লিখেছেন—

'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দামেস্কের চিহ্নিত দুস্কৃতি-কারীদের পূর্ণ তালিকা তাঁর বরাবরে দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

(মিনহাজুস সুন্নাহ খঃ ৩ পৃঃ ১৮১)

জনসাধারণের সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র আচরণ ছিলো আদর্শ শাসকের আচরণ। তাই জনসাধারণও গভীরভাবে তাঁকে ভালোবেসেছিলো। বুখারী ও মুসলিম শরীফে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে—

'তোমাদের শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক সেই ব্যক্তি যাকে তোমরা ভালোবাসো, আর সেও তোমাদের ভালোবাসে এবং তোমরা তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করো, আর সেও তোমাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করে।'

(মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ খঃ ৩ পৃঃ ৫৫২)

নিঃসন্দেহে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন তেমনি একজন আদর্শ শাসক। কেননা সিরিয়ার অধিবাসীরা তাঁকে প্রাণতুল্য ভালোবাসতো এবং জীবন দিয়ে হলেও তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নিঃশব্দে পালন করতো। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বাহিনীর একদল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন—

'এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মু'আবিয়ার আহ্বান পাওয়ামাত্র তার অনুগতরা ইনাম-পুরস্কারের লোভ না করেই ছুটে আসে এবং বছরে অন্ততঃ দু' তিনবার ইচ্ছে মত তিনি তাদের বিভিন্ন অভিযানে নিয়ে যান। পক্ষান্তরে আমি তোমাদের ডাকলে তোমারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে ছাড়ো এবং আমার বিরুদ্ধেই কোমর বেঁধে নেমে পড়ো। অথচ তোমরা বুদ্ধিমানের দল। তদুপরি নিয়মিত দান ভাতাও পেয়ে আসছো।' (তাবারী খঃ ৫ পৃঃ ১৪৮)

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র প্রতি জনসাধারণের এই সুগভীর ভালোবাসার একটি কারণ এই যে, খিলাফতের নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির দুঃখেও তিনি সমান

ব্যথিত হতেন এবং তার দুঃখ লাঘবের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরার জন্য ইতিহাসের একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

আবু সুফয়ানের আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাবিত বলেন, 'রোমকদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে আমি হযরত মু'আবিয়ার সাথে শরীক ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে এক সাধারণ সিপাহী ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলো। নিজের ঘোড়া থেকে নেমে তার সাহায্যের জন্য সবার আগে যিনি ছুটে গেলেন তিনি ছিলেন হযরত মু'আবিয়া।' (মাজমাউয্ যাওয়াইদ খঃ ৯ পৃঃ ৩৫৭)

মু'আবিয়া-চরিত্রের উল্লেখিত গুণাবলী এবং তাঁর শাসনকালের এ সব বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি শিয়া ঐতিহাসিকদের কলম থেকেও বুঝি বা তাদের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এসেছে।

দৈনন্দিন কর্মসূচী

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা মস'উদী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র দৈনন্দিন কর্মসূচীর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—

'ফজর নামায বাদ তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রেরিত রিপোর্ট শুনতেন। তারপর কোরআন তিলাওয়াত থেকে ফারিগ হয়ে ঘরে যেতেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় তদারকি করতেন। তারপর ইশরাক নামাজ আদায় করে বাহির মহলে এসে বিশিষ্ট লোকদের তলব করতেন এবং সারাদিনের জরুরী বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শে বসতেন। ইতিমধ্যে রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার নাস্তা হিসাবে হাজির হতো। নাস্তার পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। তারপর ঘরে যেতেন। অল্পক্ষণ পর বেরিয়ে এসে মসজিদে কুরসী পেতে বসে যেতেন। এ সময় সর্বস্তরের জনসাধারণ বিভিন্ন নালিশ অভিযোগ এবং অভাব প্রয়োজন নিয়ে হাজির হতো। একে একে সবার অভাব অভিযোগ তিনি শুনতেন এবং যথাসাধ্য তাদের মনোরঞ্জন ও অভাব পূরণের চেষ্টা করতেন। এভাবে সর্বশেষ ফরিয়াদী বিদায় হলে তিনি মজলিস মুলতবী করে ভিতরে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাৎকার দিতেন। তিনি তাদের বলতেন—

'বন্ধুগণ! আপনারা স্ব-স্ব গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সে সুবাদেই এই বিশিষ্ট মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ যারা পায় না, তাদের অভাব অভিযোগ আমার কাছে তুলে ধরা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব।'

তখন তারা নিজ নিজ এলাকার অভাব অভিযোগ তুলে ধরতো এবং তিনি সেগুলো প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। তারপর দুপুরের খানা হাজির করা হতো। এ সময় কাতিব লেখার সরঞ্জাম নিয়ে পাশে বসে যেতেন। আর একজন একজন করে সাক্ষাৎপ্রার্থী লিখিত বক্তব্য নিয়ে হাজির হতো। কাতিব পড়ে শুনাতেন। আর তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ বলে যেতেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থী তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দস্তরখানে শরীক হতো। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে আবার জোহরের সময় মসজিদে তাশরীফ আনতেন। জোহর বাদ উপদেষ্টা ও মন্ত্রণাদাতাদের সাথে প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় মিলিত হতেন। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত ইলম চর্চা অব্যাহত থাকতো। দিনের পাঁচটি সময় তিনি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন সাধারণ লোকদের জন্য। সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য সেখানে অবাধ অনুমতি ছিলো। সবাই সেখানে আমীরুল মুমিনীনের বরাবরে নালিশ দাখিল করতে পারতো।[১]

সহনশীলতা ও কোমল ব্যবহার

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিলো প্রবাদতুল্য। এ দু'টো ছিলো তাঁর জীবন ও চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। চরম বিরুদ্ধাচরণকারীও তাঁর মুখের উপর অশালীন ভাষা ব্যবহার করতো, অশোভন আচরণ করতো, কিন্তু তাঁর স্মিত হাসি তাতে এতটুকু ম্লান হতো না। কোমল আচরণেও কোন ফাটল ধরতো না। এ ক্ষমাসুন্দর আচরণই চরম বিরোধী বড় বড় গোত্রপ্রধানদেরও তাঁর সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিলো। ছাহাবী হযরত জাবির (রাঃ) বলেন—

'হযরত মু'আবিয়ার চেয়ে সহনশীল ব্যক্তি আমি আর দেখি নি।'

(আন্ নুজুমুয যাহিরাহ খঃ ১ পৃ ৬৪)

ইবনে আওন বলেন—

'হযরত মু'আবিয়ার আমলে একজন সাধারণ মানুষও তাঁর পথ রোধ করে বলতো, মু'আবিয়া! আমাদের সাথে তোমার আচরণ দুরস্ত করে নাও। নইলে কিন্তু আমরাই তোমাকে দুরস্ত করে ছাড়বো। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলতেন, 'ভাই! কী দিয়ে দুরস্ত করবে শুনি!' সে বলতো, 'হাতের এ লাঠি দিয়ে।' মু'আবিয়া (রাঃ) বলতেন, 'আচ্ছা, তাহলে এমনিতেই আমি দুরস্ত হয়ে যাচ্ছি, তোমার কী অভিযোগ বলো দেখি।' (তারিখুল ইসলাম লিয্যাহাবী।)

---

১. মুরূজুয্ যাহাব বিহামিশিল কামিল খঃ ৬ পৃঃ ১০৩-৫

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজেও বলতেন, 'ক্রোধ হজম করায় যে স্বাদ আমি পাই, তা অন্য কিছুতে নেই।' কিন্তু এ সহনশীলতা ছিলো ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রতিপক্ষ শান্তি বিঘ্নিত করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতো। নীতি ও আইনের প্রশ্নে সামান্যতম নমনীয়তা ছিলো না তাঁর চরিত্রে। কোথাও কঠোরতার প্রয়োজন হলে দৃঢ়তার সাথে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। কোন এক উপলক্ষে তিনি তাঁর শাসননীতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

'যেখানে চাবুকে কাজ হয় সেখানে আমি তলোয়ার বের করি না। তদ্রূপ, যেখানে মুখের কথায় কাজ হয় সেখানে চাবুক বের করি না। কারো সাথে সামান্য পরিমাণ সম্পর্ক থাকলেও তা আমি ছিন্ন হতে দেই না। মানুষ যখন টেনে ধরে আমি তখন ঢিল দিয়ে বসি, আর ওরা যখন ঢিল দেয়, আমি তখন টেনে ধরি।' (আল-ইয়াকুবী খঃ ২ পৃঃ ২৮৩)

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ক্ষমাসুন্দর চরিত্রের অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। সংক্ষিপ্ত কলেবরের কথা বিবেচনা করে এখানে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হবো।

হাদরামাউতের শাহজাদা ওয়াইল বিন হাজার ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে কিছুদিন তিনি মদীনায় থেকে গেলেন। ফেরার পথে কোন প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে শাহজাদা ওয়াইল বিন হাজারের সফরসঙ্গী করে দিলেন। শাহজাদা ওয়াইল উটের পিঠে, আর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) পদব্রজে রওয়ানা হলেন। নওমুসলিম বিধায় হযরত ওয়াইলের শাহজাদা ভাব তখনো পুরোপুরি কাটে নি। তাই হযরত মু'আবিয়াকে নিজের সাথে উটের পিঠে বসাতে তিনি নারাজ! কিছু দূর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) পায়ে হেঁটেই চললেন। মরুভূমির তপ্ত বালুতে যখন খই ফুঁটছে, তখন তিনি একান্ত অনন্যোপায় হয়ে বললেন, 'দয়া করে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিন। গরমে পা ঝলসে যাচ্ছে।'

অতটুকুতেই গলে যাওয়ার মত নরম মন কি সাহজাদাদের থাকতে আছে! নাক সিঁটকে তিনি বললেন, 'বলো কি হে! বাদশাহজাদার সাথে সওয়ার হতে পারে তেমন লোক তো তুমি নও।'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) শেষটায় মরিয়া হয়েই বললেন, 'আপনার জুতো জোড়াই না হয় আমাকে দিন; তপ্ত বালুর ঝলসানি থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাই।' শাহজাদা এবার কি বললেন শুনুন—

'বেটা বুদ্দু! আমার উটের ছায়ায় পা ফেলে চলর সুযোগ পেয়েছো এই তো ঢের।'

মোটকথা, শাহজাদা তাঁকে সাথে বসাতে কিংবা অন্য কোনভাবে দয়া দেখাতে রাজি হলেন না। ফলে নগ্নপদেই উত্তপ্ত মরুভূমির সুদীর্ঘ পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হলো।

বলাবাহুল্য যে, আভিজাত্য ও মর্যাদার ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)ও কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনিও ছিলেন কোরাইশের এক অভিজাত পরিবারের আদরের দুলাল। গোটা আরবে যে দু'চারজন লোক লেখাপড়া জানতো, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ শিরোধার্য করে শাহজাদার সমস্ত নির্দয়তা অম্লান বদনে তিনি হজম করে নিলেন। এমনকি মদীনায় ফিরে এসে রাসূলের খিদমতে কোন নালিশও করলেন না।

পরবর্তীকালে এই ওয়াইল বিন হাজার (রাঃ) কোন প্রয়োজনে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তখন গোটা ইসলামী উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমীরুল মুমিনীন। হযরত ওয়াইল (রাঃ) ভুলে গেলেও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কিন্তু তাকে চিনতে ভুল হলো না। অনেক বছর আগের সেই কিয়ামতসদৃশ ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু ক্ষমা ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সে প্রসঙ্গে একটি শব্দও মুখে আনলেন না। বরং আরবীয় মেজবানীর পূর্ণ মর্যাদা বজায় রেখে তিনি তাঁর সাথে কৃতার্থের আচরণ করলেন। (আল-ইসতী'আব তাহতাল ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৬০৫, তারীখে ইবনে খালদুন খঃ ৬ পৃঃ ৮৩৫)

নবীপ্রেম

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও প্রেম কেমন গভীর ও নিখাদ ছিলো তা নীচের ঘটনাগুলো থেকেই পাঠক কিঞ্চিৎ আন্দাজ করতে পারবেন।

একবার তিনি খবর পেলেন, বসরার এক লোকের নাকি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আকৃতিগত অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তিনি বসরার প্রশাসককে নির্দেশ পাঠালেন, 'অবিলম্বে উক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

এভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে বসরা থেকে দামেস্কে আনা হলো, আর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) দামেস্কের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন,

কপালে চুমু খেলেন এবং হাদিয়া তোহ্ফা ও ইনাম খেলাত দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন।

(আল মুজরাছ পৃঃ ৪৭)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তিত নখ, চুল ও একখানি বস্ত্র বরকত হিসাবে পরম যত্নের সাথে তিনি রেখে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর অছিয়ত ছিলো—

'এই পবিত্র নখ, চুল আমার নাক, কান ও চোখে দিয়ে দিও এবং নবীজীর কাপড়ে আমাকে দাফন করো।' (ইবনুল আছীরকৃত আল কামিল)

তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিলো: দিন-রাতের প্রতিটি কর্ম যেন নবীজীর কর্মের প্রতিবিম্ব হয়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন—

'নামায পড়ায় রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র যতটা সাদৃশ্য ছিলো, ততটা আর কারো বেলায় আমি দেখি নি।' (মাজমাউয্ যাওয়াইদ)

হযরত জাবালাহ বিন সুহায়ম বলেন, একবার আমি আমিরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র খিদমতে গেলাম। দেখি; তাঁর গলায় রশি বাঁধা, আর এক ছোট্ট ছেলে সে রশি ধরে টানছে। ছেলেটির সাথে এভাবে তিনি খেলা করছিলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমীরুল মুমিনীন! এ আপনি কী করছেন?'

তিনি ধমকের স্বরে বললেন, 'মূর্খ! চুপ করো! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, কারো কাছে শিশু থাকলে তার উচিত শিশুসুলভ আচরণ করা, যেন শিশু আনন্দ পায়।'

নবীজীর প্রতি অখণ্ড আনুগত্য

জীবনের চরম আনন্দঘন, উত্তেজনাপূর্ণ ও নাযুক মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র অবিচল আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। মিশকাত শরীফের বর্ণনার মতে—

রোমকদের সাথে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার সাময়িক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন। কিন্তু সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুর উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়া, অপ্রস্তুত রোমক বাহিনী যাতে খুব সহজেই পর্যুদস্ত হয় এবং মুসলিম বাহিনী অযথা রক্তক্ষয় থেকে বেঁচে যায়। হযরত

মু'আবিয়া (রাঃ)-র ধারণাই সত্য হলো। অতর্কিত আক্রমণের তীব্রতায় বেসামাল রোমক বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। ক্ষুধিত ব্যঘ্র যেমন বকরীর পাল তাড়া করে নিয়ে যায়, মুসলিম ফউজের ঝড়ো হাওয়ার মুখে রোমক বাহিনীর অবস্থা তার চেয়েও সংগীন হলো। অল্প সময়ে রোমের বিস্তীর্ণ এলাকা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) দখল করে নিলেন। চূড়ান্ত বিজয় যখন শুধু সময়ের প্রশ্ন ঠিক সেই মুহূর্তে ছাহাবী হযরত আমির বিন আবাসাহ (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-র সামনে এসে বললেন—

وفاء لا غدر

'বিশ্বাস রক্ষা করা মুমিনের স্বভাব, বিশ্বাস ভঙ্গ করা নয়।'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হয়রান হয়ে বললেন, কী ব্যাপার! আমর বিন আবাসাহ (রাঃ) বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি—

'দু' পক্ষে সন্ধি হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোন পক্ষই সন্ধিবিরোধী তৎপরতা চালাতে পারে না।'

হযরত আমর বিন আবাসাহ বলতে চাচ্ছিলেন, আলোচ্য হাদীছের আলোকে যুদ্ধবিরতির সময়ে হামলা পরিচালনা করা যেমন অবৈধ, তেমনি হামলার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করাও অবৈধ।

এবার ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত করে এবং শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে শুনুন। দোজাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শোনামাত্র আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করলেন, 'যুদ্ধ থামাও; ফিরে চলো।'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র নির্দেশে গোটা বিজিত এলাকা শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামী ফউজ ফিরে এলো সীমান্ত রেখার অভ্যন্তরে।

(বাবুল আমান পৃঃ ৩৪৭)

জানি না, আগে বা পরে পৃথিবীর আর কোন জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে কি না।

সরল অনাড়ম্বর জীবন

হযরত আবু মাজলায (রাঃ) বলেন—

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার কোন এক মজলিসে উপস্থি হলে সকলে

তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলো। মজলিসের এ আচরণ তাঁর খুব অপছন্দ হলো। তিনি সবাইকে বললেন—

তোমরা এমন করো না। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, 'মানুষ তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাক এটা যে পছন্দ করে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নিক।' (আল ফাতহুর রব্বানী আলা তারতীব সানাদিল ইমাম আহমদ খঃ ২২ পৃঃ ৩৫৭)

য়ুনুস বিন মায়সারাহ বলেন, দামেস্কের বাজারে হযরত মু'আবিয়াকে আমি তালি দেয়া জামা গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। একইভাবে দামেস্কের জামে মসজিদেও খলীফাতুল মুসলিমীন তালিযুক্ত পোশাকে খোতবা দিতে দাঁড়াতেন। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৩৪-১৩৫)

এ ছিলো তাঁর স্বভাবসরলতা। তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাহ্যিক শান-শওকতও তিনি অবলম্বন করেছেন। কেননা সিরিয়া ছিলো সীমান্ত শহর। তাই তিনি বাহ্যিক শান-শওকত ও জাঁকজমকের মাধ্যমেও কাফিরদের অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইতেন।

প্রথম দিকে হযরত ওমর (রাঃ)-র এটা অপছন্দ ছিলো। একবার তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করলেন, আর উত্তরে তিনি বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! এমন এক ভূখণ্ডে আমরা বাস করি যেখানে শত্রুর গুপ্তচর সর্বদা বিপুল সংখ্যায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের প্রভাবিত করার জন্য বাহ্যিক শান-শওকত প্রদর্শন করাটা জরুরী মনে হয়। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ইজ্জতও তাতে বৃদ্ধি পায়।'

উভয়ের আলোচনায় হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র এর পজ্ঞাপূর্ণ জবাব শুনে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন। দেখুন, কী সুন্দর উপায়ে নিজেকে ইনি দোষমুক্ত করে নিলেন।'

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'এজন্যই তো এর কাঁধে আমি এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছি।' (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১২৪-২৫)

ইলম ও প্রজ্ঞা

দ্বীন ও শরীয়ত এবং ইলম ও ফিকাহর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক তাঁকে অতিউচ্চ মর্তবা দান করেছিলেন। আল্লামা ইবনে হাযম ও আল্লামা ইবনে হাজার (রাঃ) বলেন, তিনি সেই বিশিষ্ট ছাহাবাদের অন্যতম, যাঁরা পূর্ণ যোগ্যতার সাথে

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করতেন। (জাওয়ামিউস সাহীহ)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোট একশ তেষট্টিটি হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে যেমন রয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত মু'আবিয়া বিন খুদায়জ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জোবায়র, হযরত সাইব বিন ইয়াযিদ ও হযরত নোমান বিন বশীর প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবা, তেমনি রয়েছেন মুহাম্মদ বিন সীরীন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, আলকামা বিন ওয়াক্কাছ, আবু ইদরিস আল খাওলানী ও আতিয়া বিন কায়স প্রমুখ তাবেয়ীগণ। (আল-ইছাবাহ খঃ ৩ পৃঃ ৪১৩)

তিনি ছিলেন খুবই উঁচু স্তরের খতীব ও বাগ্মী। বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলো যুগে যুগে আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

ইসলামী ইতিহাসশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও হয়েছিলো তাঁর হাতে। সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা সংগ্রহকারী ওবাদ বিন সারিয়াকে তিনি প্রাচীন ইতিহাস, অনারব রাজন্যবর্গের জীবনবৃত্তান্ত এবং ভাষার উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাস রচনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস গ্রন্থনার এটাই ছিলো প্রথম প্রচেষ্টা। (আল ফেহরিসত, ইবনে নাদীমকৃত)

নির্দোষ কৌতুক

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন খুবই স্মিত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের অধিকারী। যে কোন সাধারণ ব্যক্তিও নির্ভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতো এবং আবদার-অভিযোগ পেশ করতো। সম্ভব হলে তিনি সেগুলো পূরণ করে দিতেন; সম্ভব না হলে খুব কোমলভাবে তা এড়িয়ে যেতেন।

নবীজীর সুন্নত হিসাবে মাঝে মাঝে নির্দোষ কৌতুকও তিনি করতেন। জনৈক স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তি একবার তাঁর কাছে এসে আবদার জুড়ে দিয়ে বললো, আমি একটা ঘর বানাচ্ছি, আমাকে সাহায্য করুন। আপাতত কাঠ তৈরী করার জন্য বার হাজার গাছ দান করুন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঘর কোথায়? লোকটি বললো, বসরায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা ঘরটি তোমার দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কত? সে বললো, দু' মাইল তো হবে। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তখন হেসে দিয়ে বললেন—

لا تقل داری بالبصرة ولكن قل البصرة فی داری

তাহলে আমার ঘর বসরা শহরে না বলে, বলো বসরা শহর আমার ঘরে।

(আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃঃ ১৪১)

ওয়াফাত

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-র গোটা জীবন ছিলো জ্ঞান ও ইলমের আলোকে আমল ও পূণ্যের পথে পরিচালিত শিশির-শুভ্র জীবন; ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে উৎসর্গিত জীবন। এরপরও যখন তিনি দেখতেন, মতলববাজ সমালোচনাকারীদের ভিত্তিহীন অপবাদ-অভিযোগের নির্মম তীর বারবার তাঁকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে, তখন তাঁর খুবই আফসোস হতো।

একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি যে খুব দ্রুত বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন! উত্তরে তিনি বললেন, কেন নয়? আমার অবস্থা তো এই যে, মূর্খের দল একের পর এক ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করে চলেছে। সন্তোষজনক জবাব দিলেও কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে কখনো ভুল করে বসলে মুহূর্তে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। (আল-বিদায়া খঃ ৮ পৃ ১৪১)

কর্মমুখর জিহাদী জীবনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ষাট হিজরীতে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন এবং দামেস্কের মাটিতেই সমাহিত হন। তাঁর প্রতি হোক আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টি। নূরে রহমতে তাঁর কবর হোক পূর্ণ। করুণা ও কল্যাণ শিশিরে তাঁর আত্মা হোক স্নাত।

তিনি ও হযরত আলী একে অন্যের হাত ধরে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। কেননা পথ তাঁদের ভিন্ন হলেও জান্নাতই ছিলো তাঁদের উদ্দেশ্য।

জীবনের শেষ খোতবায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন— 'লোকসকল! কোন কোন ক্ষেতের ফসল কাটার সময় সমাগত। আমি তোমাদের আমীর ও শাসক ছিলাম। আমার পর আমার চেয়ে উত্তম কোন শাসক তোমরা পাবে না। যে আসবে সে আমার চেয়ে অধমই হবে, যেমন আমার পূর্বের শাসকগণ আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন।'

আলহামদুলিল্লাহ্!